আজকের গল্প

প্রতাপাদিত্য দেব

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়া দিদি শ্রীমতী রূপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে

নতুন বৌদি

দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বিয়েতে হাওড়া জেলার বালিতে গেছি। সকালবেলায় বালীগঞ্জে মেয়ের বাড়িতে গায়ে হলুদ পৌঁছতে গিয়ে দেখি-সে এক এলাহী কাণ্ড। বাবা-মা'র একমাত্র মেয়ে, দুধে আলতা গায়ের রঙ, ফর্সা, কবি জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন' কবিতার সেই চোখ। ইংরাজীতে এম.এ.। খুব স্মার্ট। অল্প পরিচয়েই আমাদের আপন করে নিলেন ঐ ভাবী বৌদি।

রাত্রে বরপক্ষের বাড়ি থেকে যখন আমরা সুসজ্জিত হয়ে গেলাম তখন আমাদের চোখে বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ সময় লেগেছিল। বিয়েবাড়ির লম্বা উঠোন জিনিষপত্রে ভর্তি। কি নেই তাতে; ডাবল ডোর ফ্রিজ, কালার টিভি, ল্যাপ্‌টপ্‌ কম্পিউটার, পি. সি., নোকিয়া কোম্পানির দামি মোবাইল সেট, বিরাট সাউণ্ডবক্স শুদ্ধ সিডি প্লেয়ার, ভিডিও ক্যামেরা। তাছাড়া আলমারী, খাট, সোফা-সেট, গহনা, পাত্রের স্যুট, দামি প্যান্ট, শার্ট, টাই, ঘড়ি, বিদেশি পারফিউম্‌ ইত্যাদি। বোধহয় পুরো বাজারটা তাঁর বাড়িতে উঠে এসেছে। বরপক্ষের লোকেদের চোখে অবিশ্বাসের ঘোর তখনও কাটেনি। ইতোমধ্যে কানে এল নিচে দাঁড় করানো সোনালি রঙের নতুন স্যান্ট্রো গাড়িটার চাবি, সিঁদুর দানের পর পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এত জিনিষপত্র যে মেয়ের বাবা দিতে পারেন তা আমাদের চিন্তার অতীত। উনি খুব ধনী ব্যবসায়ী বলেই হয়তো এটা সম্ভব হ'ল।

আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় পাত্রটি আমার চেয়ে বয়সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছরের বড়। রূপেন আর সুখেন দুই ভাই আর বিধবা মা- এই নিয়েই ওদের সংসার। রূপেনদা বিয়ের কিছুদিন বাদেই আবার বিলেত চলে যাবেন। ওখানে খুব নামকরা একটি কলেজের অধ্যাপক। দাদা আগে চলে যাবেন, পরে নতুন বৌদির পাসপোর্ট হওয়ার পর তিনিও চলে যাবেন।

বিয়ের কিছুদিন বাদেই সংবাদপত্রের পাতায় দেখি, পুলিশের সঙ্গে সুখেনদা ও তার মা ডলি জ্যেঠিমার ছবি। খুব কৌতূহল হল খবরটা বিশদ্‌ভাবে জানার। কারণ, সংবাদপত্রের বিবরণ যা ছিল বাস্তবে তার থেকেও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। আজকাল খবরের কাগজের পাতা খুললেই রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, ডাকাতি, খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ভর্তি। কাগজ পড়তে ঘেন্না ধরে যায়। কিন্তু সুখেনদা'র ছবিটায় চোখটা পড়তেই চমকে উঠলাম।

আজকের গল্প

নতুন বৌদি বিয়ের আট-দশদিন বাদে রূপেনদা'র সঙ্গে নিউমার্কেটে বেড়াতে গেছেন। দাদা বিলেত চলে যাবেন বলে দু'একটা টুকিটাকি জিনিষ কিন্‌তে গেছেন। মার্কেটের সামনে রূপেনদা গাড়ি থেকে নেমে বৌদিকে বললেন — তুমি নতুন বৌ, গায়ে অনেক গয়না রয়েছে, তোমাকে নিয়ে ভিতরে যাব না। আমি দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসছি। রূপেনদা চলে যাবার পর একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মহিলা দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে ইংরাজীতেই নতুন বৌদি-কে বল্‌লেন — যে ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে মার্কেটের ভিতরে গেলেন- তিনি কে হ'ন আপনার ?

— আমার স্বামী।

— কতদিন হ'লো আপনার বিয়ে হয়েছে ?

— এই আট-দশ দিন হবে।

— যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব ?

— বলুন।

— ভদ্রলোক, যিনি আপনার স্বামী, তিনি দশ বছর হোল লণ্ডনে আমায় বিয়ে করেছেন। আমার বাপের বাড়ি কেরালায়। আমি লণ্ডনে যে কলেজে পড়তে গিয়েছিলাম সেই কলেজেই উনি অধ্যাপনা করেন। বাচ্চা দুটি আমাদের সন্তান। রূপেন যখন একমাসের ছুটিতে আমায় কিছু না জানিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে এল তখনই আমার সন্দেহ হয়, কিছু গোলমাল আছে। পরে আমায় ফোনে জানায় যে একটি বিশেষ কাজে সে ইণ্ডিয়ায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। দিন পনের-কুড়ি বাদে লণ্ডনে ফিরবে। ও যেদিন আসে তার তিন-চার দিন বাদে আমি ওর খোঁজ নিতে এখানে আসি। আমি জানি ও কোলকাতায় এলে নিউ-মার্কেটে একবার আসবেই। সেইজন্য নিউ-মার্কেটের কাছে একটা হোটেলে আমি উঠেছি। নিয়মিত মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, আমার স্বামীকে দেখার আশায়। দ্যাখ বোন, রূপেন আমাকে এতদিন বিয়ে করেছে, দুটো বাচ্চাও হয়েছে, তাও ডিভোর্স না করে তোমার মতো একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে আমাদের দু'জনেরই সর্বনাশ করেছে। এই বলে সে ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদতে লাগল। ইতোমধ্যে রূপেনদা জিনিষ কিনে গাড়ির কাছে আসতেই কেরালিয়ান মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রূপেনদাকে বললো — তুমি নিষ্ঠুর, প্রতারক। আমাকে দশ বছর বিয়ে করে আবার ইণ্ডিয়ায় নতুন করে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা করলো না ? বাচ্চাগুলোও রূপেনদা'র দুটো হাত ধরে ড্যাডি-ড্যাডি বলে টানাটানি করতে লাগল। এক ঝট্‌কায় ওদের দু'টো হাত ছাড়িয়ে রূপেনদা গাড়িতে ঢুকে পড়ে ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে

নির্দেশ দিলেন।

বাড়ি এসে রূপেনদা তার মা ও ছোট ভাইকে সব ঘটনা খুলে বললেন। তারপর বললেন মা, তোমার নতুন বৌমা যখন সব জানতেই পেরেছে, তখন তার ব্যবস্থা তোমরাই কোরো। আমি কাল সকালেই কোলকাতায় চলে যাচ্ছি, হোটেলে দু-একদিন থেকে লণ্ডনে চলে যাব। কিন্তু আমার এই ঘটনা যেন কোনমতে বাইরে প্রকাশ না পায়। মানবাধিকার কমিশনে এই ঘটনা গেলে আমার চাকরি নিয়ে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। আমেরিকা ও বিলেতে এবিষয়ে ওদের দেশের প্রশাসন খুব কড়া পদক্ষেপ নেয়।

জ্যাঠাইমাদের পাড়ার লোকেরা প্রথম প্রথম মাঝরাতে একটা চিৎকার শুনতে পেত। তার পরেই চাপা কান্না। কিছুক্ষণ পর শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কেউ বলতে লাগল, ভূতের উৎপাত, কেউ বলল, ডাইনের উৎপাত। শান্তি-স্বস্তেন করতে হবে। কিছু উৎসাহী মহিলা চাঁদা তুলতে শুরু করলেন ভূতের উৎপাত থেকে বাঁচতে অমাবস্যায় রক্ষাকালী পুজো করার জন্য। হুজুগে মেতে উঠলেন সবাই, কিন্তু ভয়ে আওয়াজের উৎসের সন্ধান কেউ করলেন না।

জ্যাঠাইমা পাঁচ-সাত দিন পরে সুখেনদা ও বৌদিকে নিয়ে মৌলালিতে একজন নামকরা মানসিক ডাক্তারের কাছে সকালে গাড়ি করে নিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে জ্যাঠাইমা আগেই যোগাযোগ করেছিলেন। ডাক্তারবাবুর চেম্বারের বাইরে নতুন বৌদি ও সুখেনদা-কে দাঁড় করিয়ে তিনি ডাক্তারবাবুর ঘরে ঢুকে একান্তে বললেন — 'বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি, আপনাকে তো ফোনে আগেই জানিয়েছিলাম, বৌমাকেও সঙ্গে এনেছি। বাড়িতে আর রাখা যাচ্ছে না, চিরকালের মত ঘুম পাড়িয়ে দেবার ইঞ্জেক্শন দিন। আমার বড় ছেলে লণ্ডনে থাকে, আমাদের সামাজিক একটা প্রতিষ্ঠা আছে, পরিচিতি আছে, সেদিকে তাকিয়ে যাহোক কিছু ব্যবস্থা করুন, আর পারছি না, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যা টাকা লাগে আমি দেব ডাক্তারবাবু। আমার কথাটা যেন পাঁচ-কান না হয়। ডাক্তারবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন — আপনার বৌমা-কে ডাকুন। পরীক্ষা করতে হবে।'

নতুন বৌমা সলজ্জ পায়ে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন। ডাক্তারবাবু নতুন বৌদিকে বস্তে বললেন। তিনি বস্লেন না, উপরন্তু ইশারায় ডাক্তারবাবুকে জানালেন — পাশের কাঠের পার্টিশান দেওয়া চেম্বার সংলগ্ন ছোট ঘরটায় যাওয়ার জন্য।

ডাক্তারবাবু জ্যাঠাইমাকে জানালেন — আপনারা মা ও ছেলে চেম্বারের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, রোগীকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে। জ্যাঠাইমা ও সুখেনদা

প্রথমে বৌদিকে একলা ফেলে বাইরে যেতে চাইছিলেন না, কিন্তু ডাক্তারবাবুর রাশভারী গলার নির্দেশ পেয়ে বাধা দেওয়ার সাহসও পেলেন না।

ডাক্তারবাবু বৌদিকে বললেন — আপনার যা বলার খুব সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি বলুন। সময় খুব কম। বেশী দেরী হলে আপনার শাশুড়িমা সন্দেহ করতে পারেন।

নতুন বৌদি পিঠের কাপড়টা সরাতেই ডাক্তারবাবু দেখেন — ফর্সা পিঠটার উপর লম্বা কালো কালো জলভরা ফোস্কা পড়ে গেছে। ডাক্তারবাবু শিউরে উঠলেন। নতুনবৌদি আরও জানালেন, একটা ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে দু'হাত বেঁধে তাঁকে ফেলে রাখা হ'ত। খাওয়া প্রায় কিছুই মিল্‌ত না, উল্টে বাবা-মা ফোন করলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'আমি ভাল আছি, খুব সুখে আছি' বলতে হোত। একদিন ঐ কথা ফোনে বলতে অস্বীকার করায় আমার শ্বাশুড়ি ও দেওর মিলে অকথ্য গালাগালি দিয়ে অমানুষিক মারধোর করার পর লোহার শিক্ গরম করে আমার গোপনাঙ্গে ছ্যাঁকাও দিয়েছে। তারপর থেকে প্রতিদিনই আমার ওপর এই অসহ্য অত্যাচার চলতেই থাকতো। আমি আর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না ডাক্তারবাবু, আমায় মুক্তি দিন। আমি পাগল নই, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গতবছর ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাশ করেছি।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন — 'আপনার বাবার ফোন নম্বর বলুন।' নতুন বৌদি ডাক্তারবাবুর টেবিলের ওপর থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো আর পেন নিয়ে তাঁর বাবার মোবাইল ফোনের নম্বর লিখে দিলেন। ডাক্তারবাবুকে বললেন — আপনি এখন ফোন করলে যদি আমার শ্বাশুড়ি বা দেওর বাইরে থেকে শুনে ফেলেন তাহলে খুব বিপদ হবে। তারচেয়ে বরং মোবাইলে বাবাকে একটা এস.এম.এস. করুন।

ডাক্তারবাবু বললেন — বিপদের আর কি বাকী আছে মা। তুমি আমার মেয়ের মতো। আমি এখুনি মোবাইলে তোমার বাবাকে এস.এম.এস. করছি যাতে উনি এক্ষুণি এখানে এসে তোমায় উদ্ধার করেন।

ডাক্তারবাবু, নতুন বৌদি'র শ্বাশুড়ি-মা ও দেওরকে ডেকে বললেন — আমি একটা ইঞ্জেকশন্ দিয়েছি, আবার একঘন্টা বাদে আরেকটা দিতে হবে। ওকে নিয়ে চেম্বারের বাইরে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করুন। একঘন্টা বাদে আবার ডেকে নেব। ডাক্তারবাবু ওনার সহকারীকে বেল্ দিয়ে ডেকে বললেন — এই রোগীকে একঘন্টা বাদে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তুমি এই রোগীর উপরে নজর রাখবে। কোন অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানাবে। এই কথা বলে তিনি আবার রোগী দেখতে শুরু করলেন। আধঘন্টার মধ্যে

নতুন বৌদি'র বাবা লালবাজার থেকে পুলিশ নিয়ে মৌলালিতে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে এসে উপস্থিত হলেন। নতুন বৌদি'র বাবা ও তদন্তকারী পুলিশ অফিসার ডাক্তারবাবুর মুখে সব কথা শুনলেন। ঐ পুলিশ অফিসার ডাক্তারবাবুকে দিয়ে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট নিলেন। ডাক্তারবাবুর সহকারী, সাক্ষী হিসাবে সেটায় সই করলেন। তারপর ঐ পুলিশ অফিসার, জ্যাঠাইমা ও সুখেনদা-কে পুলিশ ভ্যানে চাপিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তারবাবুর দুটি হাত ধরে নতুন বৌদি'র বাবা বল্‌লেন — আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি আমার মেয়ের নবজীবন দান করলেন। তবে আমার জামাই, তাব মা ও ছোট ভাইকে ছাড়ব না। জেলের ঘানি টানাব। আমার এই ফুলের মতো সুন্দর মেয়ের ওপর এই অমানুষিক অত্যাচার কিছুতেই সইব না।

পরে জেনেছিলাম, নতুন বৌদি'র বাবা ইন্টাবপোল ও ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে রূপেনদা'র শাস্তি বিধান করেছেন। — নারী নির্যাতন ও ঠান্ডা মাথায় খুন করার পরিকল্পনার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ও অন্যান্য ধারায় ডলি জ্যাঠাইমা ও সুখেনদা-কে ছ-বছরের জেলের ঘানি টানিয়েছেন।

একদিন শনিবার অফিস ছুটির পর জি.পি.ও.-র সামনের রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি সিগ্‌ন্যালের অপেক্ষায়। এমন সময় আমার সামনে একটা সাদা বঙের মারুতি (সুজুকি) জেম্ গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত, সুবেশা মহিলা আমাকে হাত নেড়ে ডাকছেন। প্রথমটা বুঝতেই পারিনি, মুখটা চেনা চেনা লাগছিল, গাড়ির কাছে যেতেই নতুন বৌদি আমাকে কাছে ডেকে বললেন — সন্তু না? কেমন আছ? উঠে এস গাড়িতে। কতদিন বাদে দেখা। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম কিন্তু কোন কাজ হ'লো না। গাড়িতে উঠে বৌদিকে বললাম, অনেকদিন পর আপনাকে দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। কোনওদিন যে আপনার সঙ্গে আবাব দেখা হবে ভাবতেই পারিনি। সুখেনদাদের নিজের আত্মীয় বলতে ঘৃণা হয়। আপনার বিয়ের ওইটুকু সময়ে আপনার ও আপনাদের পরিবারের সকলের যে উচ্চ মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি সেটাই চিরকাল মনে থাকবে। আপনি যে আমায় এতদিন বাদে এখন চিন্‌তে পারবেন সেটাই ভাবতে পারছি না। খুব আশ্চর্য লাগছে।

নতুন বৌদি বললেন — আমি ভাই জীবনে একবারই লোক চিনতে ভুল করেছিলাম। তার মাশুল এখনও দিতে হচ্ছে। আমার বাবা, তাঁর মেয়ের উপর অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে তোমার জ্যাঠাইমা ও দাদাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন বটে কিন্তু অত্যধিক মানসিক

যন্ত্রণার চাপে স্ট্রোক্ হয়ে বাবা কিছুদিন হ'লো, আমাকে ছেড়ে চিরকালের মত মর্ত্যলোক ছাড়িয়ে স্বর্গলোকে বিরাজ করছেন। আমি তাঁর বড় ব্যবসার হাল নিজেই ধরেছি। সময়টা তো কাটাতে হবে। মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমার মা চিরকালের মত বাক্শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ফ্যাল্ করে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন। চোখ দিয়ে শুধু জলের ধারা বয়ে যায়। সে দৃষ্টিতে কত ব্যথা, কত যন্ত্রণা, আত্মজ'র প্রতি কত আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা। নতুন বৌদি আবার বললেন — আমার বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে রাত্রে বাড়ি যাবে। আমি তোমায় গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসব। বালীগঞ্জ থেকে গড়িয়া তো একটুখানি রাস্তা। তোমার বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা বলো,আমি এক্ষুণি জানিয়ে দিচ্ছি।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর গাড়িতে করে আমায় বাড়ি পৌঁছতে যাবার সময় বৌদি বললেন — বিয়ে করেছো? -এখনও করিনি। আপনার ওপর যে অত্যাচার হয়েছিল সেটা অন্তত আমার বৌয়ের ক্ষেত্রে হবে না এমনটা আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। খুব শিক্ষা হয়েছে।

কারচুপি

(কাল্পনিক ঘটনা, বাস্তবে কারো সাথে যদি মিল থাকে তবে তা লেখকের অনিচ্ছাকৃত)

একটি বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সেভিংস কাউন্টারে দেখি বিশাল চিৎকার চেঁচামেচি। ভিড় জমে গেছে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্ষীণস্বরে হাত-পা নেড়ে চেঁচাচ্ছেন — আমার সারাজীবনের জমানো টাকা আমি তুলবো, আর আপনারা বলছেন, আমি টাকা পাবনা। একি মগের মুল্লুক নাকি ? আমি একটা পুরোনো কাস্টামার, আমাকেই বলে কিনা টাকা পাবনা ? এতকাল এইখান থেকেই তো টাকা তুলছি। আপনারা নতুন বদলি হয়ে এসেছেন বলে নিয়মটাও কি পাল্টে গেল ? কাউন্টারে বসা ব্যাঙ্ক কর্মীরা কম্পিউটার স্ক্রীনে চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোককে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে দু'জনের নামে একাউন্ট-L S লেখা আছে মানে, Later or Survivor অর্থাৎ শেষে যার নাম আছে একমাত্র সেই টাকা তুলতে পারবে। ভদ্রলোকের নাম প্রথমে আছে, তাই টাকা তুলতে দেওয়া যাবে না। আমি ভিড় ও চেঁচামেচি থামাবার উদ্দেশ্যে ভদ্রলোককে আমার সামনের চেয়ারে যত্ন করে বসিয়ে এককাপ জল তারপর এক কাপ চা খাইয়ে বললাম — আপনার সমস্যাটা আমাকে খুলে বলুন। তিনি বললেন আমার সঙ্গে আমাব স্ত্রীর একাউন্ট ছিল — যেকোন একজন টাকা জমা-তোলা করতে পারতাম অর্থাৎ E or S সুবিধা কিন্তু চার-পাঁচ মাস আগে আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়। সেইজন্য আমি আমার পুত্রবধূর নামটা একাউন্টে ঢোকাবার জন্য দরখাস্ত করি। সেটা মঞ্জুরও হয়। স্ত্রীর নাম বাদ দিয়ে পুত্রবধূর সঙ্গেই আমার একাউন্ট। আমি মাঝখানে তিনমাস যাবৎ অসুস্থ হয়েছিলাম। এখন টাকার খুব দরকার। টাকা তুলতে গেলে ব্যাঙ্কের সেভিংস একাউন্টে বসা ছেলেরা বলছে — আমি টাকা তুলতে পারবো না। খুব বিপদে পড়ে এসেছি। একটু দয়া করুন। যা হোক ব্যবস্থা করে দিন। আমি তাঁর একাউন্টের সই করা কার্ডটা বের করে দেখি খুব সূক্ষভাবে E or S এর E -এর উপরের দাগ দু'টো তুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে সেটা দাঁড়িয়েছে L or S এবং সেইজন্য ভদ্রলোককে টাকা ফেরৎ দেওয়া যাচ্ছেনা। আমি ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা তোলার চেক্টা নিয়ে নিজের পকেট থেকে এক হাজার টাকা বার করে দিয়ে বললাম আপনি বৃদ্ধ মানুষ। টাকা নিয়ে সাবধানে বাড়ি যান। ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন — জানেন যেদিন থেকে বৌমা'র সঙ্গে একাউন্টটা

করলাম তারপর পর থেকেই সে খুব দুর্ব্যবহার করে, ভাল করে খেতেও দেয়না। আমার বাড়িতে বাগানের এককোণে টালির চালা বানিয়ে একজন রিক্সাওয়ালাকে থাকতে দিয়েছিলাম। সেই আমার দেখাশোনা করে। খাবার এনে খাওয়ায়। অসুখ করলে ডাক্তার, ওষুধের ব্যবস্থা সেই করে। এখনও ঐ আমায় ব্যাঙ্কে নিয়ে এসেছে। আপনার ছেলে? 'না ভাই, সে বাইরে বাইরে চাকরির জন্য থাকে, মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্য আসে, আবার চলে যায়।' ভদ্রলোককে বললাম। আমি যদ্দিন আছি, আপনার কোন অসুবিধা হবে না। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে চলে গেলেন। এইবার আমি Signature Card টা আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। পুত্রবধূর ছবিটায় চোখটা আটকে গেল। আরে এই ভদ্রমহিলাই তো তিন চার মাস ধরে ব্যাঙ্কের প্রভাবশালী কর্মীদের কাছে বিকালের দিকে প্রায়ই আসেন। তাদের সঙ্গে হাসি-মস্করা করেন। চা-পান ইত্যাদি বিনিময় হয়। বিশেষ দু'একজনের সামনে তার আঁচল মাঝে মাঝে খসেও পড়ে। খুবই অবাক লাগত। এখন তার মানেটা বুঝতে পারলাম। বৃত্ত সম্পূর্ণ হ'ল। E or S এর জায়গায় L or S রহস্যের সমাধান পেলাম। কাউকে কিছু না বলে মোটা কালি দিয়ে L টাকে F করে দিলাম। অর্থাৎ F or S মানে Former or Survivor -যতদিন বৃদ্ধ জীবিত থাকবেন তাঁর এতদিনের জমানো টাকাটা তাঁরই থাকবে। কারণ প্রথম নামটা তাঁরই। মনটা আনন্দে নেচে উঠল। যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের নায়ক আমিই। বাড়ি ফিরবার আগে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে সমস্ত ঘটনা জানালাম। তিনি আমার কাজের খুব প্রশংসা করলেন। সপ্তাহখানেক পরে ব্যাঙ্কে ঢুকেই বদলির চিঠিটা হাতে পেলাম। আরও বড় দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জায়গাটা অনেক দূরের পথ।

একটু সুখের জন্য

সরলদা চিরকালই খুব সাধাসিধে আর হিসেবী। সবসময়েই মনে ভয়, বেশ কিছু সঞ্চয় না করলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। খুবই সৎ। অসৎপথে রোজগার করে না। উদয় অস্ত পরিশ্রম করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে না। পাড়ার লোকেরা বলে — ওর নাম করলে হাঁড়ি ফাটে, ব্যাটা এত কিপ্‌টে। কিপ্‌টেপনা করে এমন বিয়ে করেছে যে বৌটাও বাঁজা। ছেলেপুলেও এতদিনে হ'ল না। ও শালার টাকা পাঁচ ভূতে খাবে। কোনো পূজোতে এক টাকাও চাঁদা দেয় না। কেউ চাঁদা চাইতে এলে কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলে — চাঁদা কি করে দেবো ভাই - সামান্য রোজগার, কোনরকমে টেনেটুনে সংসার চালাই। খিস্তি দিতে ইচ্ছে করলেও দিতে পারে না, সরলদার নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে। বড় রাস্তার ধারে গলির মোড়ে, সরলদার নিজের দোতলা বাড়ি। বাড়ির একতলায় একটা মনোহারী দোকান করেছে। এখন একটু মুদিখানার জিনিষও রাখে। দোকানের নাম 'সুলভ ষ্টোর্স'। দোকানের সাইনবোর্ডে বড় করে লিখিয়েছে-সুলভে সাংসারিক নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মালপত্র পাওয়া যায়, নগদ টাকার বিনিময়ে। টাকার অভাবে সমমূল্যের বস্তু জমা রাখিয়া মাল খরিদ করিতে হইবে। ইলেকট্রিক/টেলিফোন-এর বিল ও গ্যাস বুক্ করা হয়-পেট্রোল - ডিজেলের দামবৃদ্ধির হিসাবে কমপক্ষে নগদ পাঁচ টাকা, সর্ব্বোচ্চ দশ টাকা কমিশনের ভিত্তিতে। দোকান খুলিবার সময় সকাল ৭টা হইতে দুপুর ১২টা ও বিকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা। শনিবার অর্দ্ধ ও রবিবার পূর্ণ দিবস বন্ধ।

এরকম অদ্ভুত সাইনবোর্ড দেখে গোপাল দা আর থাকতে পারল না। হাসতে হাসতে সরলদাকে জিজ্ঞেস করল -হ্যাঁরে সরল, তোর বুদ্ধি কোনওকালেই হ'ল না। চিরকাল একই রকম রইলি। দোকানের সাইনবোর্ডে এত কথা কেউ লেখে?

বেশ গম্ভীরভাবে সরলদা বল্‌লো — আর কেউ লেখে কিনা জানিনা, আমি লিখি — ব্যাস।

গোপালদা অবাক হয়ে আবার বললো — পাড়ার দোকান-শনি-রোববারেই তো বেশী বিক্রি হবে। ঐ দিন কেউ বন্ধ রাখে?

আমি রাখি। আমার ইচ্ছে। তোমাদের এত জবাবদিহি করবো কেন হে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শনিবার দুপুরে দোকান বন্ধ করেই কোনরকমে মুখে দু-মুঠো গুঁজে সাইকেল করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সস্তায় পুরোনো খবরেব কাগজ কিনি আর রোববার

সকাল থেকেই আমি আর তোমার বৌদি দুজনে মিলে কাগজের বিভিন্ন সাইজের ঠোঙা তৈরী করি - ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ গ্রামের মাল ধরবার মতো বুঝেছো ? আমার নিজের দোকানের মাল দেওয়ার জন্য আমরা নিজেরাই ঠোঙা তৈরী করি। তার একটা আলাদা আনন্দ আছে। সে তুমি বুঝবে না। হুঁ হুঁ বাবা, পলিথিন প্যাকেট আমার দোকানে পাবে না। পলুউসানের দিকে আমি যত নজর দিই তোমরা কেউ দাও না। জীবনে তো খেটে খেতে হ'ল না, মস্তানী আর দাদাগিরি করেই কাটালে। তুমি আর আমাদের কষ্ট কি করে বুঝবে ? সাত সকালে মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে না বকে নিজের কাজে যাও। এখনও বৌনি করিনি-বেলা বেড়ে গেল।

গোপালদা আমাদের ক্লাবে এসে সকালে সরলদার সঙ্গে ঘটা ঘটনা আরও খানিকটা রঙ মিশিয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী সহকারে তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগল। সেই কথা শুনে আমি, দিলীপ, জগা, বঙ্কা সবাই হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলাম। পেট ফেটে যাবার যোগাড়। গোপালদা বলল — ও এত সরল বলেই ওর বাপ্ ওকে ঐ 'সরল' নাম দিয়েছে।

আজ সকাল থেকেই ক্লাবঘরে টানটান উত্তেজনা। ইণ্ডিয়া-অষ্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের দিনের খেলা-সারাক্ষণ কি হয়, কি হয় ভাব। টি.ভি.র সামনে থেকে কেউ নড়ছে না। শেষ পর্যন্ত ইণ্ডিয়া অষ্ট্রেলিয়াকে তিন উইকেটে হারালো। সৌরভ ম্যান অব দি ম্যাচ। বাঙালীর গর্ব। ভারতের গর্ব। বঙ্কা আর থাকতে পারল না। আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল — কথাটা পাঁচ কান করবি না — এত আনন্দ, একটু মাল না খেলে চলছে না মাইরি। তাড়াতাড়ি তোরা চানাচুর ফানাচুর কিনে আন। বোতলের খরচা আমার। আমরা শুধু চার-পাঁচজন কলেজ-বন্ধু মিলে খাব, বাকি সকলে ক্লাব থেকে কেটে যাবার পর। আমি বললুম — সে আর বলতে। ও নিয়ে কিছু ভাবিস্ না। আমি এই গেলুম আর এলুম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কোনো চিন্তা নেই বঙ্কা, এখন তুইই হিরো, বাকি সব জিরো।

অগত্যা আমি আর গোপালদা- সরলদার দোকানের কাছে এসেই দেখি, ও দোকান বন্ধ করতে যাচ্ছে। আর একটু দেরী হলে খোলা পাওয়া যেতো না। আবার এই রাত্তিরে দূরের দোকানে দৌড়াতে হোত। দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম — সরলদা, দোকান বন্ধ কোরো না, আমরা জিনিষ কিনবো! দোকানে ঢুকতেই সরলদা ব্যাজার মুখে বলল — হাবু কি চাই ? তাড়াতাড়ি বল্।

— পাঁচশ মত চানাচুর আর ভাঙা কাজু, কিশ্‌মিশ্ মিলিয়ে তিনশ।

— মাল খাবি বুঝি ?

—— এইই তোমার বড় দোষ । এইজন্যে তোমার দোকানে আস্‌তে ইচ্ছে করে না । অত কথার কি আছে শুনি ? জিনিষ কিন্‌তে এসেছি, জিনিষ দাও, পয়সা নাও । মিটে গেল ঝামেলা-ব্যাস্‌ । কি, কেন, কোথায়-এত ফাল্‌তু ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ কোরো না তো । তাড়াতাড়ি করো ।

—— তোকে দেখলে বড় কষ্ট হয় রে । ছোট থেকে দেখ্‌ছি । ভাল ঘরের ছেলে তুই, গোপলাদের পাল্লায় পড়ে এত কম্‌ বয়সে বখে গেলি ।

শালা জ্ঞানদা —— জ্ঞান মারাচ্ছে ।

সরলদা আলাদা আলাদা পলিথিন প্যাকে চানাচুর, ভাঙা কাজু, কিশ্‌মিশ্‌ ওজন করে আমাদের দিলো । খুব অবাক হলাম আমরা । থাক্‌তে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম —— হ্যাঁগো সরলদা, গোপালদার কাছে শুনেছিলাম তুমি নাকি পলিউস্‌নের জন্য পলিথিনের ঠোঙা ব্যবহার কর না । তুমি আর বৌদি দুজনে মিলে কাগজের ঠোঙা নিজে হাতে বানিয়ে বিক্রি কর । তা আজ হঠাৎ পলিপ্যাক, কি ব্যাপার ? সূর্য কোন দিকে উঠল ?

এই কথা শুনে সরলদার মুখটা চুপ্‌সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল । মনে হল, ওর মুখের ওপর একশ ওয়াস্টের বাল্বটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেল । মুখটা ঝুলে পড়ল কন্ঠার কাছে । ফ্যাসফেসে গলায় ধীরে ধীরে বল্‌লো —— তোর বৌদি কদিন আগে পোড়া সংসারের মুখে **‘লাথি মেরে’** চলে গেছে রে-আমাকে একা ফেলে । কোনওদিনও তো ভাল করে খাওয়াতে পরাতে পারিনি, একটা চাপা দুঃখু মনে ছিল । খুব অভিমানী । যাক্‌গে-ওখানে গিয়ে যদি একটু সুখ পায় ।

কাঁচঘর

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হানাহানির ঘটনা চরমে উঠেছে। বিশেষতঃ কোলকাতার কমবয়সী যুবকদের, মানে যারা সদ্য যৌবন প্রাপ্ত, তাদের নানারকম পুলিশি হয়রানির অথবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের টানাহেঁচড়ার মধ্যে টিকে থাকাই দায় হয়ে উঠেছিল। সংসারের বয়স্ক মানুষেরা চেষ্টা করছিলেন তাদের বাড়ির ছেলেদের দূরে কোথাও আত্মীয় বাড়িতে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দিতে। স্কুল-কলেজ প্রায়ই বন্ধ, সন্ধ্যার সময় পাড়ার রাস্তার আলোগুলো নিভে থাকতো। রাস্তার দিকের জানালাগুলো বন্ধ রাখতে হ'ত কারণ যখন-তখন বোমের টুকরো খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে।

আমাকেও সেইরকম অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন বাইরে থাকতে হয়েছিল। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে আত্মীয় বাড়িতে থাকতাম। কোন কাজকর্ম নেই। সারাদিন টো টো করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো।

ওখানকার হাই স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ভদ্রলোকের নাম মাধব সরকার। বাংলা ও ইংরাজীতে এম.এ.। বি.এড. পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। ভদ্রলোক স্বাধীনতাসংগ্রামী। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সম্মান, তাম্রপত্রও পেয়েছেন। খুবই ভদ্র, সজ্জন মানুষ। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি ছোট, নবম শ্রেণীতে পড়ে। মেয়েটি সিউড়ি কলেজে বি.এ. পড়ছে।

ভদ্রলোকের আমাকে খুবই ভালো লেগেছে। প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন। ভদ্রলোকের দুটো বিশেষ গুণ ছিলো, ভালো গল্প বলতে পারেন, আর ভালো রাঁধতে পারেন। আমার এখানে সময় কাটতে চাইছে না। বাড়ি থেকে গুরুজনেরা চিঠি মারফৎ নির্দেশ পাঠাচ্ছেন — "সমবয়সীদের সঙ্গে বেশী বন্ধুত্ব, মেলামেশা না করাই ভাল। অচেনা জায়গায়, যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।" এই নির্দেশ পেয়ে আমিও সেটা পালন করার চেষ্টা করি। সেই কারণে বয়স্ক মানুষদের সঙ্গেই একটু গল্প গুজব করি।

ঐ প্রধান শিক্ষকমশায়ের বাড়িতে প্রায়ই সন্ধ্যের পর যাই আর স্বাধীনতাসংগ্রামীদের রোমহর্ষক গল্প শুনি। ক্রমে মাধববাবুর সংসারের একজন সদস্যের মত হয়ে গেলাম।

বেশ কিছুদিন পর রাজনৈতিক আবহাওয়া একটু স্থিতিশীল হ'লে আমি কোলকাতায় ফিরে এলাম।

অনেকদিন আর মাধববাবুদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। তাদের কথা প্রায় ভুলে গেছি।

বেলঘরিয়ায় আমার বন্ধুর দাদার বিয়ে। আমাদের চার-পাঁচজন বন্ধুদের তিন-চারদিন ধরে নেমতন্ন। বিয়েবাড়ির ঘর সাজানো, হাওড়া ব্রীজের তলায় জগন্নাথ ঘাট থেকে ফুলের বাজার-কাঁচা বাজার করা, ক্যাটারারকে তদারকি করা, সব আমাদের দায়িত্ব কারণ এই বন্ধুর দাদা দিল্লিতে কাজ করেন। বিয়ের জন্য ক'দিন ছুটি নিয়ে এখানে এসেছেন। বৌভাতের পরে একসপ্তাহ বাদে দিল্লি ফিরে যাবেন তাঁর কর্ম্মস্থলে। সে কারণে তাঁর এখানে বন্ধুর সংখ্যা কম। অনেকের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই। আমাদেরই সবকিছু দেখাশোনা করতে হচ্ছে।

বন্ধুর সঙ্গে ওর দাদার বিয়ের আগের দিন সকালে কাঁচা বাজার করতে বেলঘরিয়া বাজারে ঢুকেছি। এমনসময় আমার পিঠে কার হাতের আলতো চাপ পড়লো। ঘাড় ঘোরাতেই দেখি — মাধববাবু, সিউড়ির সেই প্রধান শিক্ষকমশাই। আমি চমকে উঠে বলি — আপনি এখানে ? আমি তো ভাবতেই পারিনি আপনাকে এখানে দেখতে পাব।

— আমি তো তাই ভাবতেই পারছিনা। তুমি এখানে ? তোমার বাড়ি তো কোলকাতার বৌবাজারে। অনেকক্ষণ ধরে তোমায় দেখছি কিন্তু ভরসা করে ডাকতে পারছিলাম না। কাছে এসে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে তারপর তোমার পিঠে হাত দিলাম। কাছেই আমার বাড়ি। তিনমাস হলো অবসর নিয়েছি। আমার বাড়িতে চলো, ভাত-টাত খেয়ে, গল্প করে বিকেলে ফিরবে।

আজ বাজার সেরে আপনার বাড়িটা দেখে নোব। কাল বন্ধুর বাড়ি থেকে জলখাবার খেয়ে আপনার বাড়ি দশটা নাগাদ যাব। এখানে বিয়েবাড়ি এসেছি। মাসিমাকে বলবেন, ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা যেন না করে। ঘন্টা দুয়েক গল্প করে আসব।

মাধববাবু হতাশস্বরে বললেন — তাই হবে। কাল কিন্তু আসা চাই-ই।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ মাধববাবুর বাড়ি আমি একাই গেলাম। মাধববাবু, মাসিমা, তার ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখে খুব খুশী। মেয়ে বি.এ. পাশ করেছে। ছেলেটি স্থানীয় ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজে বি.কম. দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর মাধববাবু হঠাৎ আমার হাতদুটো ধরে ঝরঝর করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তুমি আমায় বাঁচাও বাবা, খুব বিপদে পড়েছি। তোমাকে গতকাল বাজারে দেখতে পেয়ে ভাবলাম, পরমেশ্বর তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। তুমি তাঁরই

প্রেরিত দূত। কতরাত যে ঘুমোতে পারিনি তার ঠিক নেই। পরম করুণাময়ের কাছে সবসময় প্রার্থনা করি আমার এই বিপদ তুমি উদ্ধার কর প্রভু।

আমি বলি — শক্ত হোন, মনের জোর রাখুন। আপনি তো ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামী। দেশ স্বাধীন করার ব্রতে জেলও খেটেছেন। আপনারাই তো আমাদের আদর্শ। এখন নীতিহীন রাজনীতিতে দেশটা ভরে গেছে। আপনারাই তো আলোর দিশারী — পথ প্রদর্শক। অন্ধকার থেকে আলোর পথ, সমাজকে আপনারাই দেখাবেন। আপনি প্রধান শিক্ষক, মানুষ গড়ার কারিগর। আপনি ভেঙে পড়লে কি করে চলবে ?

— না বাবা, আমার মনের জোর হারিয়ে গেছে। আমি রিক্ত।

— আসল ঘটনাটা কি হয়েছে খুলে বলুন ?

মাধববাবু বললেন — আমাব মেয়ে তো খুব সুশ্রী নয়, বরং কুরূপাই বলা চলে। রোগা, কালো, মাঝাবি গডন। ওর বিয়েব জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হয়নি। যদিও এক জায়গায় পাত্রপক্ষের পছন্দ হ'লো কিন্তু প্রচুর পণ চাওয়ায় দিতে পারিনি। সেইজন্য আমি ও তোমার মাসিমা মরমে মরে আছি। লজ্জায় মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। তাকে জন্ম দিয়েছি কিন্তু সুষ্ঠু ভাবে পাত্রস্থ করতে না পেরে মানসিক অবসাদে দুজনেই ভুগছি।

হঠাৎ একদিন তোমাব মাসিমা আবিষ্কার করলো, মেয়ে মা হতে চলেছে। ডাক্তার দেখানো হ'লো। ডাক্তারবাবু প্রস্রাব, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার পর বললেন — তিনমাস বাদে আপনি দিদা হবেন। মাসিমা লোকলজ্জাব ভয়ে চেয়েছিলেন বাচ্চাকে নষ্ট করে দিতে, কিন্তু মেয়ে অরাজী। ডাক্তারবাবুও বললেন — প্রথম বাচ্চা নষ্ট করবেন না। বাচ্চার মায়ের শারীরিক ক্ষতি হবে। যার ফলে সারাজীবন তাকে ভুগতে হবে।

মাধববাবু বললেন — আমি এখানে অবসর নেওয়ার পর এসেছি। সেরকম চেনাশোনাও নেই। তুমি বাবা একটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে ব্যবস্থা কর মেয়ের বিয়ের।

তা না হয় করলাম, কিন্তু ছেলেটি কে যে এরকম সর্বনাশ করলো ?

মাসিমা অনেক কষ্টে মেয়ের কাছ থেকে তার নাম জেনেছে। সে আমারই সিউড়ীর স্কুলের ছাত্র-এবছর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট বেরোতে এখনও মাস তিনেক বাকী।

আমি মাধববাবুকে বললাম — তাহলে চিন্তার কারণ নেই। আপনি তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন। আমাকে একটা সাদা কাগজে আপনার মেয়ে ও

ঐ ছেলেটির নাম, ঠিকানা, জন্মতারিখ, শিক্ষাগত যোগ্যতা লিখে দিন। দেখি কি করতে পারি। তবে ছেলেটি এলেই আমাকে একটা চিঠি লিখে জানাবেন। আমার বন্ধুর হাত দিয়ে, যার দাদার বিয়েতে এখানে এসেছি। ওকে দিলেই আমি পেয়ে যাব। ওর নাম জীবন দে, স্টেশনের কাছেই থাকে। ও খুব জনপ্রিয়, কোলকাতা মাঠে প্রথম ডিভিসনে একটা বড় ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে। ওখানে যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই ওর ঠিকানা দেখিয়ে দেবে।

— তুমি বাবা একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আমাদের পরিবারশুদ্ধ আত্মহত্যা করতে হবে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। অত সম্মানীয় মানুষ, স্বাধীনতাসংগ্রামী। তাঁর আজ কি অসহায়-করুণ অবস্থা।

কয়েকদিন বাদেই মাধববাবুর চিঠি পেয়ে ওনার বাড়িতে গেলাম। উনি আমাকে বললেন — এই তাপস, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। আমার ছাত্র। ছেলেটি ব্রাহ্মণ।

দেখলাম-ছেলেটি ফর্সা, রোগা, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বয়স অনুযায়ী বেশ লম্বা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। খুব লাজুক চেহারা। মাধববাবুকে বললাম — আগামীকাল সকাল দশটায় শিয়ালদহ স্টেশনের মেন গেটে আমি থাকব। আপনারা চলে আসুন। আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি।

পরের দিন সকাল দশটার পাঁচমিনিট আগেই আমি শিয়ালদহ স্টেশনের মেন গেটে পৌঁছে গেলাম। ওনারা দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সিতে আমরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে পৌঁছলাম। ঐখানে একটা পুরানো পাঁচতলা বাড়ির দোতলায় ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিস। আমরা পৌনে এগারোটার সময় অফিসে পৌঁছে গেলাম। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখি ওনার মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট চেয়ারে বসে আছেন। সমানের টেবিলে কিছু খাতাপত্র, ফাইল রয়েছে। টেবিলের উল্টোদিকে পাঁচ ছটা প্লাস্টিকের চেয়ার রয়েছে। আমাদের মত যারা এখানে কাজে আসে তাদের বসার জন্য। ভদ্রমহিলা বেশ সপ্রতিভ, বয়স ত্রিশ বত্রিশ মত হবে। রেজিষ্ট্রার খুলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন পাত্র-পাত্রী এবং তাদের অভিভাবক সব এসেছেন তো?

— হ্যাঁ

— স্যার এগারোটার সময় চেম্বারে আসবেন। সময় নষ্ট না করে তার আগের কাজগুলো সেরে নি। পাত্র, পাত্রী, তাদের নাম, ঠিকানা বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা সব এখানে লিখে

আপনারা সই করুন। পাত্রীর তরফে কে এসেছেন?

মাধববাবু বললেন — আমি, পাত্রীর পিতা।

ঐ ভদ্রমহিলা বললেন — পাত্রের তরফে কে এসেছেন?

— আমি। পাত্রের দূর সম্পর্কের দাদা এবং লোকাল গার্জেন। কারণ আপনাকে তো আগেই বলেছি পাত্রেব বাড়ি বীরভূমে।

— এখানে তাহলে কার কাছে থাকে?

— আমার কাছে।

আমি মিথ্যা কথা বলিনা কিন্তু এক্ষেত্রে মাধববাবুর মান রক্ষার্থে ব'লতে হোল। আমি তাপসকে আগেই আমার ঠিকানা দিয়ে রেখেছিলাম যাতে কোন অসুবিধা না হয়। মাধববাবুও অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। উনি বুঝতে পাবছেন কত বড় বিপদেব ঝুঁকি নিয়ে আমি সমাজসেবা করছি। রেজিষ্ট্রারে সবকিছু সই হয়ে যাবার পর, ভদ্রমহিলা আমাকে বাইরের বড় লম্বা টানা বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন — আপনার বয়সও তো খুব কম। বছর বাইশ-তেইশ হবে?

— হ্যাঁ।

— কোন চাকরি কিংবা ব্যবসা করেন, না পুরো সময়ের বেকার?

— ঠিকই ধরেছেন। অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়েছি কিন্তু পাশ করার পর বছর ঘুরতে চলল-কোন চাকরি পাচ্ছিনা। তাই এখন অখণ্ড অবসর। একটু সমাজসেবা করার চেষ্টা করছি মাত্র।

ভদ্রমহিলা রাগতস্বরে বললেন — এইটুকু ছেলে, লজ্জা করেনা এইসব ঝামেলায় জড়াতে। বাড়িতে বাবা, মা জানে?

— না।

— তাহলে কোন সাহসে ছেলেটাকে তোমার ঠিকানা দিলে?

— খুব ভুল হয়ে গেছে দিদিভাই। আর কোনদিন হবে না।

— তুমি জান, ছেলেটা অপ্রাপ্তবয়স্ক, আঠারো বছর হতে দু'মাস বাকী আর মেয়েটা সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমি তোমায় ভাল কথা বলছি — এখুনি এখান থেকে পালাও। পেছনের সিঁড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি।

— না দিদিভাই, তা সম্ভব নয়। মাধববাবুকে আমি কথা দিয়েছি। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁকে আমি বলেছি তাঁর এই বিপদে আমি পাশে আছি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত না করলে তাঁর পুরো পরিবারটাই লোকলজ্জার ভয়ে বিষ খেয়ে

আত্মহত্যা করতো।

— এইটুকু ছেলে, অল্পবয়সেই পেকে গেছো। 'মাধববাবুকে কথা দিয়েছি' — কিন্তু তোমার বাড়িতে যদি পুলিশের হাঙ্গামা হয় তোমার বাবা-মা'র মুখটাও তো পুড়বে তোমার জন্য। সে বুদ্ধি নেই।

— ভুল হয়ে গেছে। আর কখনো এসব ঝামেলায় থাক্‌ব না।

— ছেলেটা অপ্রাপ্তবয়স্ক। ছেলের বাবা যদি পুলিশে ডায়ারী করে যে তার নাবালক ছেলেকে তোমরা জোর করে বিয়ে দিয়েছো তাহলে পুলিশের রুলের গুঁতোর সঙ্গে জেল খাটতে হবে। সরকারি অফিসে কোনদিন চাকরি পাবে না।

— তাহলে কি হবে দিদিভাই?

— কি আর হবে, পুলিশের ঠ্যাঙানি খাবে।

— দিদিভাই দয়া করে বাঁচান। আপনার পায়ে পড়ি।

মনে মনে ভাবছি হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি দেখায়। দিদিভাই আমার থেকে খুব জোর আট-দশ বছর বড় কিন্তু এমন ওস্তাদি মারছে যে রাগ ধরে যাচ্ছে। কিছু বলতেও পারছি না। মুখ বুজে হজম করতে হচ্ছে তার বাক্যবাণ।

— শোন, একটা উপায় আছে। সেটা কতখানি তোমার দ্বারা সম্ভব হবে জানিনা। ছেলেটার যতদিন না আঠারো বছর বয়স হচ্ছে ততদিন তাকে মেয়ের বাড়ি আটকে রাখবে। রাস্তায় বেরোতে দেবে না। ও ছাড়া পেলেই কিন্তু ওর নিজের বাবা-মার কাছে বীরভূমে পালাবে। হঠাৎ একটা ক্ষণিকের ভুলে এই কাণ্ড সে করে ফেলেছে। মেয়েটাও তো খুব কুশ্রী, কুরূপা। কখনোই ছেলেটা তাকে নিয়ে ঘর করবে না। যদি আঠারো বছরের আগে ছেলেটা তার নিজের বাবার কাছে যায় তাহলে তার বাবা স্বাভাবিকভাবেই পুলিশে রিপোর্ট করবে, তখন তোমার জেল খাটা কেউ আটকাতে পারবে না।

— আমি কথা দিচ্ছি দিদিভাই, ছেলেটাকে আঠারো বছরের আগে মেয়ের বাড়ি থেকে পালাতে দোব না।

— মনে থাকে যেন। তা নাহলে বিপদে পড়বে।

আমরা দু'জন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘরে ঢুকলাম। তার চেম্বারের বাইরে নীল আলো জ্বলছে। এতক্ষণ লাল আলো জ্বলছিল তার মানে ভদ্রলোক এসে গেছেন।

দিদিভাই টেবিল থেকে রেজিস্ট্রার খাতাপত্র ফাইল নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন। আমাদের একটু পরে ডাক পড়ল। আমরা সকলে মিলে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের চেম্বারে ঢুকলাম।

মধ্যবয়সী ভদ্রলোক চেম্বারে বসে আছেন। খুব রাশভারী, মেদবহুল ভারিক্কী চেহারা। উনি আমাদের তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। সেখানে প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে বিবাহপর্ব সাঙ্গ হ'ল। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কালীঘাট মন্দিরে গেলাম। সেখানে পুরোহিত ধরে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী সিঁদুরদান পর্ব সেরে মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়া হল। পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের মায়ের প্রসাদী ফুল, প্রসাদ দিল। মাধববাবু আমাদের প্রসাদ ভাগ করে দিলেন। বাড়ির জন্যও কিছু সঙ্গে নিলেন। আমাকে বললেন — তুমি আমার খুব উপকার করলে। নিজের সন্তান হলেও এতটা করতো কিনা জানিনা। যাইহোক, বাবা তুমি কিন্তু আমার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসবে। এখন চলো, তোমাদের কিছু মিষ্টি খাওয়াই। অনেকক্ষণ ধরে কাজকর্ম করছ। সকলেরই খুব ধকল গেছে। মেয়েটাও এত বেলা অবধি কিছু খায়নি চিন্তার কারণে। আমরা আবার কালীঘাট থেকে ট্যাক্সিতে ধর্মতলায় এসে একটা ভাল হোটেলে ঢুকলাম। ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ, চাটনি খাওয়া হলো। তারপর পাশে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে দু'টো করে রসগোল্লা খেলাম।

মাধববাবুকে একান্তে ডেকে বললাম — স্যার, এবার আমাকে একটু বাড়ি যেতে হবে। তার আগে এদের আড়ালে আপনাকে আলাদা দু'একটা জরুরী কথা বলার আছে।

— বলো বাবা, কি বলবে?

— ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সহকারী ঐ ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছেন — তাপসের আঠারো বছর বয়স হ'তে আর প্রায় দু'মাস বাকি। আঠারো বছর বয়সের আগে কোন অবস্থাতেই তাপস যেন আপনার বাড়ি থেকে পালাতে না পারে। খুব চোখে চোখে রাখবেন। আপনার মেয়েকেও বলবেন তাপসের ওপর নজর রাখতে। তাপস যদি পালিয়ে যায় তাহলে ওর বাবা, আপনাদের ও আমার নামে পুলিশে কেস করবে — জোর করে আটকে ওনার নাবালক ছেলেকে বিয়ে দেবার জন্য। আপনার মত মানী, সম্মানীয় মানুষকে পুলিশ হয়রান করবে, ভাবলে কষ্ট হচ্ছে। এটা চিন্তাও করতে পারিনা।

— খুব ভালো কথা বলেছো বাবা। এদিকটা মাথায় আসেনি। চিরকাল পড়াশুনা নিয়ে থেকেছি। এখন এই বুড়ো বয়সে এত ঝামেলা কি আর সহ্য হয়। তুমি কিছু চিন্তা কোরনা, আমি কথা দিচ্ছি-আঠারো বছর বয়সের আগে তাপসকে কিছুতেই বাড়ি পালাতে দোব না। এখন চল — আবার একটা ট্যাক্সি ধরে শিয়ালদহ স্টেশনে যাই। যাবার পথে বৌবাজারে তোমার বাড়িতে তোমায় নামিয়ে দোব।

বাড়ি ফিরে এসে খানিকটা পাখার তলায় জামা খুলে বিশ্রাম নিলাম। সারা শরীর

দিয়ে যেন গরমের হলকানি বের হচ্ছে। নানা বাজে চিন্তায় মাথাটাও দপ্‌দপ্‌ করছে। স্নান করলে যদি কমে। মিনিট পনেরো বিশ্রাম নিয়ে খুব ভালো করে সুগন্ধি সাবান দিয়ে স্নান করলাম। মনটা ভালো লাগল, মেজাজটাও একটু ঠিক হ'লো। মা দুপুরের খাওয়াব জন্য ডাকলেন। মায়ের হাতের তরকারি, ভাত খেয়ে শরীরটা একটু সুস্থ হল। তারপর বিকাল ছ'টা অবধি টানা ঘুম। মার ডাকে ঘুম ভাঙল — পিঠে হাত দিয়ে ঠেলছেন আর বলছেন — কতক্ষণ ঘুমোবি-বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। গরম চা এনেছি-খেলে যদি তোর ঘুমটা কাটে।

দু'দিন বাদে মনে হলো-যাই, মাধববাবুর বাড়ি, একবার দেখে আসি তাপসের কি অবস্থা। এইভাবে প্রায়ই তিন-চারদিন অন্তর ওখানে যেতাম তাপসকে দেখতে। ওকে দেখলে তবেই আমার বুকের ধুকপুকানিটা একটু কমত।

এইভাবে যাতায়াত করছি। কখন যে দু'মাস পেরিয়ে গেছে খেয়াল নেই। একদিন মাধববাবুর বাড়ি গেছি — হঠাৎ উনি আমায় আনন্দে দু'হাত বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন — যাক বাবা, বাঁচা গেল। গতকাল তাপসের আঠার বছর বয়সপূর্ণ হল। ওর মাধ্যমিকের এ্যাডমিট কার্ডের একটা কপি আমার কাছে লুকোনো ছিল। সেটাতেই দেখলাম। মুক্তি, মুক্তি। কি আনন্দ যে হচ্ছে তা বলতে পারবো না। তোমারও রেহাই, আমাবও রেহাই। আর পুলিশ কেসের ঝামেলা নেই। তাপসও বাড়ি যাবে বলে ছটফট করছিল। আমি বলেছি-সপ্তাহখানেক বাদে ও সন্তানের পিতা হবে, সেই সুখবরটা নিয়েই যেন বাড়ি যায়। এতদিন কষ্ট করলে, আর একটু কষ্ট কর। সপ্তাহ দুয়েক পরে মাধববাবুর বাড়িতে গিয়ে শুনি — বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাপস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মাধববাবু ও মাসিমাকে তাঁদের মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতেই দু'জনের চোখ জলে ভরে উঠল। মাসীমা মুখ নীচু করে মাটিতে পা ঘষতে লাগলেন। কোন কথা নেই। নিস্তব্ধ-থমথমে পবিবেশ। নীরবতা ভঙ্গ করে মাধববাবু বললেন — আমরা আর দাদু দিদা হ'তে পারলাম না। বিয়ের চিন্তায়, লজ্জায়, ভয়ে মেয়ের প্রেসারটা খুব বেড়ে গিয়েছিলো। বাচ্চাটা পেটেই নষ্ট হযে গেছে। পরে জেনেছিলাম-পুত্র সন্তান, সুন্দর দেখতে। এই কথা শুনে-আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ কোন কথা না বলে বাড়ি ফিরে এলাম। আর মাধববাবুব বাড়ির দিকে কোনদিন যাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয় — মাধববাবুরা কেমন আছেন? ওনার কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী পুনরায় শুনতে ইচ্ছে হয়।

আমি রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে বর্তমানে কল্যাণীর কাছে মদনপুর

রেলস্টেশনের স্টেশন মাষ্টার। আমার এক মেয়ে। পাঁচ বছর বয়স। স্থানীয় স্কুলে শিশু শ্রেণীতে পড়ে। খুব ছটফটে, সবসময় বাড়িতে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ওর মা বলে — মেয়েটা ছেলে হতে হতে মেয়ে হয়ে গেছে বলে এত উচ্ছল, প্রাণবন্ত।

একদিন দুপুরবেলা অফিসে খুব কাজের চাপ পড়েছে। বাড়িতে দুপুরের ভাত খেতে যেতে পারিনি। আমাকে অবাক করে দিয়ে ভেজানো দরজা খুলে আমার মেয়ে তার মার হাত ধরে হাজির। সরমার হাতে একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার।

— অনেকক্ষণ খাবার নিয়ে অপেক্ষা করার পর ভাবলাম তুমি হয়ত কাজে ব্যস্ত। সেইজন্যেই ভাত নিয়ে চলে এলাম।

মেয়ে কলকল করে বলল জানো বাবা, আমাদের স্টেশনে একটা পাগলী এসেছে। এখানে আসার সময় দেখলুম। খুব ভয় করছে। তুমি তাড়াতাড়ি ওকে তাড়িয়ে দাও।

আমি মেয়েকে বলি — ও নিজে এখানে এসেছে, নিজেই চলে যাবে, আমি তো আছি। ভয় কি?

মেয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে অফিস ঘরের বাইরে নিয়ে এল। আমার স্ত্রীও এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। দু'ঘন্টার আগে আপ-ডাউনে কোন ট্রেন নেই। দু'একটা কুলি আর গোটা দশ-পনেরো পুরুষ-মহিলা স্টেশনের যাত্রী শেডের নীচে বসে আছে।

আমি দেখি একটু দূরে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় একটা মাঝবয়সী কালোমত মেয়ে দু'হাতে ধূলো উড়িয়ে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর বিড়বিড় করে বকছে। চুলগুলোয় জটা পড়ে গেছে। মেয়ে তো ভয়ে আমার কোলে উঠে পড়েছে। সরমাও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওরও বোধহয় ভয় করছে। মুখে কিছু বলতে পারছে না।

কাছাকাছি আসতেই পাগলির মুখটা চেনা চেনা লাগল। দু'হাতে আকাশের দিকে ধূলো ছুঁড়ছে আর বলছে — যাঃ, স্বামীও পগারপার, বাচ্চাও পগারপার। দাওনা গো, আমার স্বামী, বাচ্চাকে কেউ খুঁজে দাওনা গো? তোমাদের পায়ে পড়ি। দেবে, খুঁজে দেবে? এইসব কাণ্ড করতে করতে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল। আমি অফিসঘর তালা দিয়ে, পাশেরঘরে টিকিটবাবুকে বলে, সরমার কষ্ট করে আনা টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে বাড়ির পথ ধরলাম। খাওয়ার ইচ্ছেটাই নষ্ট হয়ে গেল।

ঘটনাটা মনে পড়লেই মাঝেমাঝে আজও বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে অব্যক্ত যন্ত্রণায়।

প্রতিচ্ছবি

কোলকাতার কাছে এক মফঃস্বল শহরে বেশ কিছুদিন হ'লো আমি নতুন বাড়ি করেছি। অফিসের সহকর্ম্মীদের উৎসাহে আমি উত্তর কোলকাতার একটা স্যাঁতসেতে এক চিলতে গলির নোনা ধরা দেওয়ালের ইঁট, বালি বেরিয়ে পড়া একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার এক কামরা ঘরের বাসাবাড়ির পাট চুকিয়ে এখানে তিনকাঠা জমি কিনে, পূর্ব-দক্ষিণ দিক খোলা একটা ছোট্ট বাড়ি করেছি। আলো হাওয়ায় ঘর ভর্ত্তি। কোলকাতার বাসা বাড়িতে দিনের বেলায় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হোতো। প্রকৃতির হাওয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। যা বসন্তকাল তাই হেমন্তকাল। মনে হোত বাসা বাড়িটা যেন কয়েদখানা। বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা করত না। এখন নতুন বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিতে খানিকটা ফুলের বাগান করেছি। কোলকাতা থেকে এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বুকভরা খানিক দূষণমুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে পারি। ঘরের জানলা দিয়ে খোলা আকাশ, রাত্রে আকাশের চাঁদ দেখতে পেয়ে মন জুড়িয়ে যায়। কোলকাতার ঘরে স্যাঁতসেতে নোংরা নোনা ধরা দেওয়াল আর প্রকৃতির জীব বলতে বড় বড় টিকটিকি, আরশোলা, মাকড়সা আর রাত্রে দু-একটা চড়ুই পাখি কড়িকাঠে রাত্রিবাস করত। মনে হয়, পাতাল থেকে এসে এখানে স্বর্গে বাস করছি।

শনি, রবিবার বিকেলে বাড়ির ব্যালকনিতে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করি। বিভিন্ন রঙের ফুলেদের গায়ে যখন প্রাকৃতিক স্নিগ্ধ বাতাস দোলা দিয়ে যায়, মনে হয় ফুলগুলো এ ওর গায়ের স্পর্শ পেতে চায়, মনের কথা বলতে চায়। তখন কবিগুরুর কবিতার দু-এক ছত্র মনে পড়ে — "ওলো সই ইচ্ছে করে, তোদের মত মনের কথা কই।" এই সময়টা সম্পূর্ণ আমার একার। সেইজন্য এই সময়টা একটুও অন্য কাজে নষ্ট করি না, যতটা পারি প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণ করার চেষ্টা করি। কারণ আমার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে ওর মা শনিবার বিকালে আঁকা শেখাতে আর রবিবার বিকালে যায় গান শেখাতে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে খানিকটা নিজস্ব সময় থাকা উচিত, সব দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে সামাল দিয়েও। নিজের জীবনের ডায়েরীর পাতাগুলোও প্রাকৃতিক নিয়মে মাঝে মাঝে উল্টে গিয়ে পুরানো স্মৃতির ছবিটাকে ফ্ল্যাশব্যাকের মত মানসপটে দৃশ্যমান করে তোলে। তারই মধ্যে সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনা সবই আছে। এ সবের মধ্যেই বেঁচে

থাকা। জীবনের চরম পরিণতির দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলা। চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি.........

আমাদের এই ছোট্ট শহরে উচ্চশিক্ষিতা, সংস্কৃতিমনস্কা এক ভদ্রমহিলা রমাদি একদিন রাত্রি আটটা নাগাদ দূরভাষে আমায় নিমন্ত্রণ জানালেন, তাঁর বাড়িতে সপ্তাহখানেক বাদে সন্ধ্যা ছ'টায় নববর্ষের ঘরোয়া আড্ডায় যোগদান করার জন্য।

এলাকার বিভিন্ন মান্যগণ্য সংস্কৃতি চেতনা সম্পন্ন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের নক্ষত্র সমাবেশ। তারমধ্যে রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, চাকুরিজীবী, ব্যবসাদার ইত্যাদি। ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলেও প্রায় সত্তর-আশিজনের উপস্থিতি, রমাদির বিরাট হলঘরে। রমাদি ও তাঁর স্বামী খুবই সুজন, অতিথিবৎসল।

বিকাল ছ'টায় অনুষ্ঠানের শুরু, কবি প্রণামের মাধ্যমে। ঐ নববর্ষের আড্ডায় যখন আমি রমাদির দোতলার সাদা মার্বেল বিছানো হলঘরে প্রবেশ করছি তখন ঐ ঘরের এককোণে এক মাঝবয়সী, সুন্দরী মহিলা আমার দিকে অবাক চোখে চাইলেন। তাঁর চোখ দুটিও খুব সুন্দর। সেই চোখে একইসঙ্গে আনন্দ, বিস্ময় ও বেদনার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠল। তাঁর ঐ ভাসা ভাসা অপূর্ব সুন্দর চোখ, তারসঙ্গে মুখটা খুব চেনা চেনা মনে হ'ল কিন্তু কিছুতেই মনে কবতে পারলাম না। সঙ্গে তাঁর সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়েও রয়েছে। মার সঙ্গে মেয়ের মুখের বেশ মিল আছে।

কাউকে চেনা চেনা মনে হলেও যদি তাকে চিন্‌তে না পারি তাহলে খুব অস্বস্তি হয়। যতক্ষণ না তাকে মনে পড়ে ততক্ষণ খুবই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকি। এটা বোধহয় এখন আমার বেশী বয়সের কারণে। মস্তিষ্কের কোষগুলো বোধহয় মরে যাচ্ছে ; নতুন করে আর কোষ জন্মাচ্ছে না। খুব ভয় লাগে অ্যালঝাইমার রোগের শিকার না হয়ে পড়ি। যাইহোক, ঐ অনুষ্ঠানের আমি বিশেষ অতিথি। ফলে বেশী চিন্তা করার অবকাশ নেই। যথারীতি আমার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসন গ্রহণ করলাম।

অনুষ্ঠান খুবই চিত্তাকর্ষক হচ্ছে। কিন্তু গান, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ কোন কিছুই আমার মনে সেভাবে রেখাপাত করছে না। আমি শুধু আপনমনে ঐ মাঝবয়সী আবছা চেনা চেনা ভদ্রমহিলাকে কোথায় দেখেছি সেই চিন্তায় প্রাণপণে স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় কি ? আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছি।

ইতোমধ্যে আমাকে নববর্ষের তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য স্বরক্ষেপণ যন্ত্রের

মাধ্যমে রমাদি আহ্বান জানালেন। উত্তরে আমি সবিনয়ে জানালাম — এত সুন্দর মনোরম বৈশাখী অনুষ্ঠানের মাঝে বক্তৃতা দিয়ে রসভঙ্গ করব না। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে আমি দু'চার কথা নিশ্চয়ই বলব। আসলে ভাষণ দোব কি — আমি তো নিজের স্মৃতির মণিকোঠায় হাতড়ে বেড়াচ্ছি। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি — ঐ ভদ্রমহিলাকে এত চেনা চেনা লাগছে অথচ এতক্ষণ ধরে, তাঁকে চিনতেই পারছি না।

চিন্তার সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। রমাদি ঘোষণা করলেন এবার আপনাদের সুমিষ্ট কন্ঠে গান শোনাবেন - তিথি চ্যাটার্জী, সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করবেন সৌরদীপ পাল।

তিথি হারমোনিয়ামটায় একটু সুর বাজিয়ে নিয়ে বল্‌ল - আজকের নববর্ষের পুণ্য তিথিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া অন্য কারুর নাম প্রথমে মনে পড়ে না। তাই ওঁনাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও আপনাদের নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি — 'সখী ভাবনা কাহারে বলে ....সখী ভালোবাসা কারে কয়, সেকি কেবলি যাতনাময়।'

আমার শরীরে হঠাৎ বিদ্যুৎ-এর চমকের সঙ্গে শিহরণ খেলে গেল। যে স্মৃতির ভাণ্ডারে এতক্ষণ প্রাণপণে একটুকরো স্মৃতির সন্ধান করছিলাম, এক লহমায় তা মনে পড়ে গেল। যাক্ কি শান্তি। এতক্ষণ লড়াই-এর পর এই শান্তি কত তৃপ্তির তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। সবে কোলকাতার এক নামজাদা কো-এডুকেশন কলেজে পড়তে ঢুকেছি। যৌবনের শুরু তে যা অনেক বাঙালী ছেলেমেয়েব হয় তাই একটু-আধটু কবিতা লিখি। কলেজের পত্রিকায় ও অন্যান্য লিট্‌ল ম্যাগাজিনে তা মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হয়। অবসর সময়ে রেডিয়োতে গান শুনি। নামকরা ওস্তাদজীর কাছে নাড়া বেঁধেছি-তবলা শেখার জন্য। আমার কলেজের বন্ধু সুদীপ্ত বল্‌লো — মেয়েদের চোখে পড়ার মত তো ভালোই কবিতা লিখ্‌ছিস্। জলসায় এদিক ওদিক গান-বাজানাব সঙ্গে তবলাও বাজাচ্ছিস। আরও ভাল হয়, যদি কাজ চালানো গোছের হাত দেখা শিখতে পারিস। তাহলেই কেল্লা ফতে। মেয়েরা তখন তোর সঙ্গে আলাপ করার জন্য লাইন লাগিয়ে দেবে। আমি বলি — দূর-তোর যত পাগলামি। তা কখনও হয় নাকি! আমি কাগজের পাতায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ভণ্ড জ্যোতিষীদের মত হতে পারবো না। কলেজে পড়ব পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে আর ঐ অবৈজ্ঞানিক বুজরুকি জিনিস শিখব না। শুধু শুধু সময়ের অপচয়। ঐসব লোক ঠকানো কারবার আমি করতে পারব না। সে তুই যাই মনে করিস না কেন। সুদীপ্ত বললো — তুই একটা আস্ত গাধা। কোনদিন তোর দ্বারা প্রেম হবে

না। শুধু শুধু আর কবিতা লিখিস না। যখন তোর মনে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, তখন কবিতা লেখাও পণ্ডশ্রম। কবিতা লেখা ছেড়ে দে। কোন মেয়েই তোর মত মেনীমুখো গাধাকে পছন্দ করবে না। মেয়েরা পৌরুষ ও সুন্দরের পূজারী। এইসব কথা বলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সুদীপ্ত গট্‌গট্‌ করে কোনদিকে না তাকিয়ে চলে গেল।

সুদীপ্ত রাগের মাথায় যেসব কথা বলে চলে গেল সেই তপ্ত বাক্য মুখ বুজে সহ্য করতে কষ্টে হচ্ছিল, সেইসঙ্গে যৌবন বয়সের জেদটাও চেপে ধরলো। স্থানীয় পাঠাগার থেকে 'কিরো'র লেখা হাত দেখার কতগুলো বই মন দিয়ে ঝড়ের গতিতে পড়ে ফেল্‌লাম। রাস্তা-ঘাটে, আত্মীয়-সমাগমে, কলেজে যত চেনা ছেলেমেয়ে তাদের হাত টেনে নিয়ে একটু-আধটু বলার চেষ্টা করি আসলে হাত দেখার বই পড়ার বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ মিলে যায়। মনটাও আনন্দ ভরে ওঠে।

বেশ কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন সুদীপ্ত ঝোড়ো হাওয়ার মতো এসে আমায় আনন্দে জড়িয়ে ধরে বলল — এই তো বাবা বেশ ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ। হাত দেখার বিদ্যেটা তো ভালই রপ্ত করেছ। এতদিনে ঠিক লাইনে এসেছ। এবার খোলা ময়দানে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ো। ব্যবস্থা একটা হবেই।

— আমি বলি, তুইতো চিরকাল চ্যাংড়াই ছিলি। হঠাৎ ভদ্রলোক হলি কি ব্যাপার ?

— কেন ?

— আমাকে তুই ছেড়ে তুমি সম্বোধন করছিস্‌।

ও হাসতে হাসতে বলল — একটা সুখবর আছে-দিন পনেরো বাদে কলেজের স্যোসাল ফাংশান হবে। আমি প্রিন্সিপালকে বলেছি-এই অনুষ্ঠানে তুই স্বরচিত কবিতা পাঠ করবি আর কলেজের দু'চারজন ছাত্র-ছাত্রীদের গান, গিটার ইত্যাদির সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবি। আমি বলি — তুই আমাকে না জানিয়ে প্রিন্সিপালকে ঐসব কথা বল্‌লি কেন ? আমি ঐদিন কলেজেই আসব না। সুদীপ্ত মুচ্‌কি হেসে বল্‌ল — দেখা যাক।

ঐ ঘটনার তিন-চার দিন বাদে কলেজের প্রিন্সিপালের ঘরে আমার জরুরী ডাক পড়ল। কলেজের বেয়ারা রাখহরিদা আমাদের ক্লাসরুমে এসে বল্‌ল — স্যার তোমাকে ডাকছেন। এক্ষুণি চল, জরুরী দরকার। আমি ভয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে প্রিন্সিপালের ঘরের সুইং ডোরটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই স্যার বল্‌লেন — শোন-সুদীপ্তর কাছে তোমার বিষয়ে সব শুনেছি। তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনব না, সামনের স্যোসাল ফাংশানে তোমায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করতে হবে। আর দু'চারজন ছাত্র-ছাত্রীর

গান বাজনার সঙ্গে তবলা বাজাতে হবে। খুব ভাল করে তৈরী হয়ে আসবে যাতে বাইরের গণ্যমাণ্য অতিথিদের সামনে আমাদের কলেজের মুখরক্ষা হয়, সুনাম অক্ষুন্ন থাকে।

কলেজ স্যোসালের দিন যথারীতি স্বরচিত কবিতা পাঠ করলাম। হাততালিতে হলঘর ফেটে পড়ল। আমার মনটাও খুশীতে ভরে গেল। এমনসময় স্বরক্ষেপণ যন্ত্রে ঐ অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ঘোষণা করলেন —— কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী স্মৃতি ব্যানার্জী রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করবেন। তবলা সঙ্গত করবেন একাধারে কবি ও তবলিয়া স্বপন চ্যাটার্জী-অর্থাৎ কিনা আমি। মঞ্চে ওঠার সময় দেখলাম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, তন্বী, সুশ্রী, সপ্রতিভ একটি মেয়ে আমার পিছনেই মঞ্চে উঠে আসছে। মঞ্চে বসে হারমোনিয়ামটা খানিকটা বাজিয়ে নিয়ে বল্‌ল —— উপস্থিত গুরুজনদের নমস্কার ও সতীর্থদের প্রীতি, শুভেচ্ছা জানিয়ে বল্‌ছি - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব্যতিত বাংলার সংস্কৃতি চর্চার কথা চিন্তাও করা যায় না, তাই তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমি দু'একটি গান আপনাদের শোনাব। প্রথমেই গাইল —— 'সখী, ভাবনা কাহারে বলে..........

ক্রমশঃ তার সঙ্গে আলাপ হ'ল। ঘনিষ্ঠতাও হ'ল। একে অপরকে একদিন দেখতে না পেলে ভাবতাম জীবনটাই বৃথা। কখন সকলের অজান্তে যে আমরা পরস্পরের ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি তা নিজেরাই জানিনা। যখনই ওর সঙ্গে দেখা হ'ত তখনই ওর কাছে গান শোনার আব্দার করলে ও আমাকে ওই গানটা শোনাত —— সখী, ভাবনা কাহারে বলে। আমি ওকে কপট রাগ দেখিয়ে বল্‌তাম —— তুমি যখনই গান গাও তখনই প্রথমে ভালবাসা কেবলই যাতনাময় গানটা গাও কেন? ভালবাসা আনন্দের, ভালোবাসা খুশির, ভালোবাসা উচ্ছ্বল যৌবনের প্রতীক, ভালোবাসা চিরন্তন। তোমার আর আমার প্রেম, ভালোবাসা জন্মজন্মান্তরের, সে কথা বোঝ না কেন? উত্তর বলতো —— বেদনা, আর্তি, যাতনা না থাকলে ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না। শুধু শরীরি সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ভালবাসা জন্মায় না। প্রেম, ভালোবাসা একটা স্বর্গীয় অনুভূতির ব্যাপার। তার গায়ে কোন কালিমা লেপন করা উচিত নয়। অতএব ভালোবাসাকে সম্মান দিতে শেখ। ছেলেমানুষি কোর না-বুঝলে মশাই।'

তারপর কলেজের পাঠ মিটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এসসি পড়তে চলে গেছি। পড়ার চাপে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সেভাবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়না। তারপর চাকরী জীবনের শুরু। প্রথম প্রেমের গভীরতা আছে, কিন্তু বাস্তবের চাপে সেটা অনেক আব্‌ছা, ফিকে হয়ে গেছে। আমি নিজের কাজে ব্যস্ত। কলেজের অধ্যাপনা, খাতা দেখার ফাঁকে নিজস্ব

সত্তাটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। স্মৃতির কথা প্রায় ভুলেই গেছি। অল্পবয়সে জীবনের প্রথম প্রেম বলে মাঝে মাঝে আমার স্মৃতির দরজায় তার কড়া নাড়ার আওয়াজ পাই।

আজ আমি অপ্রত্যাশিতভাবে এতদিন পরে তাকে এখানে এভাবে আবিষ্কার করবো, ভাবতেই পারিনি না। আমি এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার মূহুর্তে তার চোখের তীক্ষ্ণ অবাক বিহ্বল দৃষ্টিটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। ওকে একবার একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারছি না — তুমি কি এখনও আমাকে আগের মত ভালোবাসো? তোমার মেয়েকে দিয়ে 'সখী ভাবনা কাহারে বলে' ....গানটা গাইয়ে আমাকে নিজের কাছে অপরাধী করে দিলে'। তুমি তো এতদিন বাদেও, একবার আমার দিকে পলকে তাকিয়েই আমাকে চিনতে পারলে, যদিও আমার ও তোমার শারীরিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তোমার তন্বী চেহারাটা এখন আর নেই, একটু পৃথুলা হয়েছো বটে কিন্তু তাতে তোমাকে আরও সুন্দরী, মোহময়ী লাগছে। তোমার প্রথম জীবনের প্রেম, ভালোবাসার রঙ এখনও তোমার কাছে ফিকে হয়ে যায়নি। তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। অথচ তুমি কত নিষ্পাপ, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে — কত অব্যক্ত বেদনা তোমার মুখে। আমার নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। তুমি আমার অমার্জনীয় অপরাধ ক্ষমা করো স্মৃতি। ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। ক্ষমা করো.......

অব্যক্ত যন্ত্রণা

অফিসের কাজে কোলকাতা থেকে বদলি হয়ে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর এসেছি প্রায় তিন-চার মাস। কোন্নগর ষ্টেশন থেকে যেকোন একটা লোকাল ট্রেনে চাপলেই শ্রীরামপুর স্টেশনে সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাই। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল লাইনে তিন-চার মাস ডেলী প্যাসাঞ্জারীর কারণে কিছু কিছু সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে।

আমি সাধারণতঃ টেনের চালকরে সঙ্গে লাগোয়া যে কামরা থাকে সেটাতেই উঠি। ব্যাণ্ডেল অথবা বর্ধমান লোকালে উঠলে প্রায়ই দেখি বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বেঁটে-খাটো গোলগাল চেহারা, কালো রঙ, রোদে পুড়ে একটু তামাটে হয়ে গেছে, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, পাজামা ও বাটিকের পাঞ্জাবী পরা হাতে কালো ফোলিও ব্যাগ নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে এক ভদ্রলোক দৌড়তে-দৌড়তে, হাঁফাতে-হাঁফাতে এই কামরায় এসে ওঠেন। উঠেই এদিক ওদিক ভিড় ঠেলে কাউকে খুঁজতে থাকেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম যে কোন স্টেশনে ট্রেন থামলেই ঐ ভদ্রলোক পিছন দিকের কামরার দিক থেকে সামনের দিকের কামরার কাছে চেঁচাতে-চেঁচাতে ছুটে আসছেন-সুপ্রিয়াদি-ও সুপ্রিয়াদি, আছেন নাকি? আমি —— এখানে। আপনার বসার সিট রেখেছি।

যারা নিত্যদিনের যাত্রী তাদের কাছে এটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমি প্রথম প্রথম খুব অবাক হতাম। বেশ বিরক্তও লাগত। ঐ রকম বেঁটে কালো হাতির মত চেহারা, বয়সও খুব একটা কম নয় তাও রোজ রোজ এই একই কাণ্ড।

সুপ্রিয়াদি বলে যখন তিনি চেঁচাতেন, 'সু'-টা প্রায়ই শোনা যেতনা। আমাদের কানে 'প্রিয়াদি আছেন'.........প্রিয়াদি......... । কিছু নিত্যযাত্রী তরুণ যুবক টিপ্পনি কাটত—— তোর প্রিয়া এ কামরার নেই। আর চিৎকার সহ্য হচ্ছে না। কানটাকে একটু শান্তি দে। কেউ বললেন-শব্দদূষণ হচ্ছে, মানবাধিকার কমিশনে যাব ভাবছি। সক্কালবেলায় মাথাটা গরম হয়ে গেলে অফিসেও কাজে ভুল হয়। মেজাজটা সারাদিন খিঁচড়ে থাকে। আবার কোন কোন নিত্যযাত্রী ঐ ভদ্রলোককে কাছে ডেকে খুবই আপনজনের মত বলেন - আপনার প্রিয়াদি তো এখানে নেই, আমাদের কাউকে চলবে? তাহলে আমরা আপনার 'সুপ্রিয়াদি'-জন্য রাখা জায়গায় বসতে পারি। এই বাদুড়ঝোলা হয়ে যেতে হয়না। ঐ ভদ্রলোক কিন্তু নির্বিকার। ভাবলেশহীন মুখ কোন কথারই উত্তর দেন না। সেখান থেকে

ধীরে সরে যান। তারপর যথারীতি নিত্যদিনের রুটিনমাফিক উত্তেজিতভাবে তার 'সুপ্রিয়াদি'র খোঁজ করতে থাকেন।

যেদিন আমাদের কামরায় দেখা যায় সুপ্রিয়াদি রয়েছেন সেদিন ঐ ভদ্রলোকের কি আনন্দ। তার রোদে পোড়া তামাটে মুখটায় শতশত চাঁদের হাসির বান ডেকে যায়। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চিরুণী বার করে মাথার চুলটায় একটু বুলিয়ে নিয়েই কালো ঘামে ভেজা মুখটায় রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে একটু ফর্সা করার চেষ্টা করেন। তারপরই হিন্দী সিনেমার হিরোর স্টাইলে সুপ্রিয়াদির পাশে বসা যাত্রীকে ইশারায় একটু সরে বসার আবেদন জানিয়ে তক্ষুণি ঝপাং করে প্রায় তাদের কোলের ওপরেই ঐ ঘামে ভেজা ধুমসো চেহারা নিয়ে বসে পড়েন-কে কি ভাবলো তার তোয়াক্কা না করে।

ঐ ভদ্রলোকের অসাক্ষাতে সুপ্রিয়াদি একদিন বলেন — আপনারা কিছু মনে করবেন না, তড়িৎদা'র কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আসলে আমরা তো চুঁচুড়া অবধি যাই। সেই কারণে একটু গল্প করতে করতে যাওয়ার লোভ উনি সামলাতে পারেন না। আমি ওখানকার একটা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করি আর তড়িৎদা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিসে কাজ করেন। সুপ্রিয়াদি আরও বলেন উনি বেলুড় থেকে ও তড়িৎবাবু উত্তরপাড়া থেকে ট্রেনে ওঠেন। তারপর যথারীতি তড়িৎবাবুর হাঁকডাক যথানিয়মে চলতে থাকে। আর আমরাও ট্রেনে যাওয়ার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাই। রসিকতা, টিপ্পনির আওয়াজে ট্রেনের মধ্যে অফিস যাওয়ার সময়টা বেশ ভালোই কাটে।

কিছুদিন পর একদিন ট্রেনে উঠেই দেখি দরজার পাশে বাঁশে বাঁধা একটা লাশ চট্ দিয়ে জড়ানো রয়েছে। লাশ থেকে রক্ত চোঁয়ানো আঁশটে গন্ধযুক্ত হালকা লাল রঙের জল সামান্য গড়িয়ে পড়ছে। তাকে ঘিরে মাছির দল ভন্‌ভন্ করে উড়ছে ও চটের গায়ে বসছে। দুটো ডোম লাশটাকে ঘিরে বসে আছে; শেওড়াফুলি ষ্টেশনে নামবে-জি.আর.পি. অফিসে নিয়ে যাবে।

তড়িৎবাবু রোজকার রুটিনমাফিক 'সুপ্রিয়াদি আছেন নাকি' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে রিষড়া স্টেশনে আমাদের ঐ দুর্গন্ধযুক্ত কামরায় উঠেই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একটু দূরে আমাদের কাছে এসে ভাষণ দিতে শুরু করলেন — এইরকম যাত্রীভর্তি কামরায় অফিস যাওয়ার সময় কেউ এরকম কাটাপড়া লাশ তোলে ? কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। দুর্গন্ধে বমি উঠে আসছে মশাই। দু'তিন জন যাত্রীকে ঠেলে সরিয়ে জানালা দিয়ে কামরার বাইরে তিন-চারবার থুথু ফেললেন। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে ঢোক ঢোক করে জল

গিলতে লাগলেন। তার খুবই অস্বস্তি হচ্ছে বোঝা গেল। বেশ বিরক্তি সহকারে বলতে লাগলেন ট্রেনটা আজ যেন চলতেই চাইছে না। এত আস্তে চলছে বিরক্ত লাগছে। এই নোংরা গন্ধের মধ্যে ট্রেনে থাকা! শ্রীরামপুর এলেই নেমে যাব। অসহ্য, দম আটকে আসছে। সরকারের কোনও নজর নেই। রেলমন্ত্রীও দেখেনা। এইসমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেনে পচাগলা লাশ নিয়ে যাচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। যখন তড়িৎবাবু এই সমস্ত কথা বলে তার অন্তরের ক্ষোভ-উস্মা-বিরক্তি প্রকাশ করছেন এমন সময় ট্রেনটা শ্রীরামপুর স্টেশনে ঢুকছে। তাই দেখে তড়িৎবাবু কামরার অন্যান্য সহযাত্রীদের ঠেলে সরিয়ে তাড়াতাড়ি নামবার প্রস্তুতি শুরু করেন।

এমন সময় একটি কমবয়সী যুবক যে প্রায়ই তড়িৎবাবুকে টিপ্পনি কাট্‌ত সে বল্‌ল — 'রোজই তো প্রিয়াদি আছেন, প্রিয়াদি আছেন' বলে চিৎকার করতেন - ওনাকে কি আজ খুঁজে পেয়েছেন?'

— না ভাই।

তা পাবেন কি করে, নীচের দিকে চেয়ে দেখুন!

এই কথা শুনে আমাদের সকলের চোখ ঐ বস্তায় মোড়া লাশটার দিকে যায়। ট্রেনের দুলুনিতে চটের বস্তাটা একটু আলগা হয়ে ফাঁক হয়ে আছে। বেশ কিছু মাছি লাশটার চারপাশ ঘিরে ভন্‌ভন্‌ করে উড়ছে। চটের বস্তার ফাঁকে উঁকি মারছে সুপ্রিয়াদি'র হাঁ করা শুকনো মুখ। চোখ দু'টো বীভৎসভাবে চোখের গর্ত থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মনে হয়, সুপ্রিয়াদি যেন তড়িৎবাবুকে তাঁর কিছু অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা বলতে চাইছেন।

......................জীবন বয়ে চলে তার আপন গতিতে।

সংগ্রামের সাথী

হঠাৎ ঝুপ করে সমুদ্রের অতল গহ্বরে তালিয়ে গেল অতীন। প্রাণপণে বাঁচার চেষ্টায় ধড়ফড় করে হাত পা ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠতেই কোমরে বেশ বেদনা বোধ করল, ঘুমের ঘোরে চৌকি থেকে মেঝেতে পড়ে গিয়েই এই বিপত্তি।

অতীন ভীষণ ঘেমে উঠেছে। সে ঢকঢক করে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেল। দড়ির আলনা থেকে গামছাটা নিয়ে ভালো করে গা হাত পা মুছে হাত পাখাটা খুঁজতে গিয়ে দেখে তার আট মাসের বাচ্চাটা হাত পাখাটা সর্বশক্তিতে কামড়াবার চেষ্টা করছে। এত রাতেও বাচ্চার চোখে এখন ঘুম নেই। গীর্জার ঘড়িতে রাত দুটো বেজেছে। তার ঘন্টার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। বাচ্চাটার হাত থেকে হাত পাখাটা টেনে নিয়ে অতীন জোরে নাড়াতে লাগল। নাঃ একেবারেই অসহ্য এই গরম। কানের দুপাশটা এখনও গরম হয়ে আছে। পাখাটা কেড়ে নেওয়ায় বাচ্চাটা ঘ্যান ঘ্যান করছে। লক্ষ্মী অন্যদিন হলে বোধহয় স্বামীকে কিছু বলত কিন্তু আজ এই মুহুর্তে তার কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। পাশ ফিরে বাচ্চাটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বুকের দুধ দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

ধূর শালা - ঘুম বোধহয় আজ রেলের লোকেদের কারো বাড়ীতেই নেই। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে আর সহজে আসতে চায় না। তাই নানা চিন্তার ভীড়ে অতীন ক্রমে হারিয়ে যেতে লাগল।

.........আগামীকাল ৮ই মে। তাদের মানে অতীনের মত অনেক রেল কর্মচারীদের একটি বিরাট সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবার দিন। অতীন ভাবছে — সবাই কি এই ধর্মঘটে যোগদান করবে। কিন্তু যদি এই ধর্মঘটের কোন সুষ্ঠু মিমাংসা না হয় এবং অনির্দ্দিষ্টকাল চলে তাহলে তার বিধবা মা, স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাটার মুখে কি করে অন্ন জোটাবে। কিভাবে তার ঘরোয়া নানা সমস্যার সমাধান করবে।

যদি এই ধর্মঘটে যোগদান না করি তাহলে আমার চাকরীতে তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট হবে। আমার ছোট্ট সোনা বড় হয়ে এই রেলেতেই কাজ পাবে। তার বিয়ে দিয়ে খুব সুন্দর একটা ফুটফুটে বৌ আনব।

খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে অতীনের মুখের ওপর। চোখ খুলল অতীন। চোখটা কোঁচকালো, রোদের দিক থেকে মুখ ফেরালো। তাকালো দক্ষিণের জানালাটার কাছে ছোট কাঠের টেবিলটায় বসান টেবিল ঘড়িটার দিকে। সাড়ে ছটা বেজে গেছে। লক্ষ্মী

চায়ের দুটো কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকালো। পরে অতীনের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল — কিগো, তাড়াতাড়ি উঠে পড়। অফিস যাবে না ? তুমিও কি রতনদা, শ্যামলদার মত ধর্মঘটে যোগ দেবে নাকি শেষমেষ ?

অতীন লক্ষ্মীর হাত থেকে গরম চায়ের একটা কাপ নিয়ে বেশ জোরেই শব্দ করে চুমুক দিল। ঠোঁটটা একটু পুড়ে গেল বোধহয়। বাচ্চাটা চৌকাঠ পার হওয়ার চেষ্টা করছে। নতুন হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। তাই বেশ সময় লাগছে চৌকাঠটা পেরোতে। অতীন লক্ষ্মীর দিকে তাকাল, কাছে ডাকল। লক্ষ্মী কাছে আসতে অতীন তাকে পাশে বসাল। তারপর ডানহাতটা দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে বাসি মুখেই আদর করে লক্ষ্মীকে চুমু খেয়ে বললো — তাড়া নেই, রান্নার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, অফিস যাব না। এখুনি আমাদেব কলোনির মাঠে এই ধর্মঘটের সমর্থনে একটা মিটিং-এ যেতে হবে।

নিরুদ্দেশ

সুদেববাবু সরকারি অফিস থেকে অবসরগ্রহণের পর হঠাৎ একদিন ভোরবেলা তাঁর বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সুদেববাবুর বাড়ি হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে। সুদেববাবু তাঁর স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে মোটামুটি সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। মেয়ে বড়, ছেলে ছোট। মেয়েকে উত্তরবঙ্গে এক কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে অনেককাল আগে বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর একমাত্র নাতির বয়স ১২-১৩ বছর। মাঝে-মধ্যে মেয়ে বাপের বাড়ি আসে। স্ত্রী চিররুগ্না, বাতের রোগী। সদ্য-যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেটি চাকরী অথবা ব্যবসার জন্যে সকাল থেকে রাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনদিকেই কিছু সুরাহা করতে না পেরে সুদেববাবুকে ধরেছিল, তাঁর অবসরগ্রহণের পর প্রাপ্ত টাকা থেকে ব্যবসা করার জন্য এক লাখ টাকা চাই। কিন্তু সুদেববাবু, ছেলের এই প্রস্তাবে রাজি হননি। কারণ, পঁয়ত্রিশ বছর সরকারী চাকরী করে এসে ছেলের ব্যবসায় ঝুঁকি নিতে সাহস করতে পাবেন নি। একদিন রাত্রে ছেলে তার মাকে এসে ধরল, বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এক লাখ টাকার যদি ব্যবস্থা হয় তাহলে সে ব্যবসা করে দাঁড়াতে পারবে, কারণ চাকরি তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সুদেববাবুর স্ত্রী অনেক করে সুদেববাবুকে রাজি করাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওঁনার এক কথা — 'তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, বড় করেছি, এবার তার নিজের ব্যবস্থা, নিজেকে করতে বলো। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোমাদের খাওয়া-পরার কোন অভাব হবে না। কিন্তু টাকা আমি কিছুতেই দেব না। এই আমার শেষ কথা।' তারপর বেশ কিছুক্ষণ ছেলের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হ'ল। মা অসহায় চোখে বাপ-ছেলের ঝগড়া শুনতে লাগলেন। পরের দিন ভোরবেলা সুদেববাবু নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

থানায় ডায়ারী করা হ'ল। টিভিতে, দৈনিক সংবাদপত্রে সুদেববাবুর ছবিসহ নিরুদ্দেশের খবর প্রকাশিত হ'তে লাগল। কিন্তু সুদেববাবুর খবর আর পাওয়া গেল না।

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কাছে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে কিছুদিন হ'লো এক ভদ্রলোক সামান্য জমি কিনে একটা টালির চালা বানিয়ে বসবাস করেন। ঘরের সামনে এক চিল্‌তে জমিতে মরসুমি সবজী ও ফুলের চাষ করেন। তাঁর বাড়ির সামনে কাউকে দাঁড়াতে দেখলে, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে — রে রে করে একটা ছোট বাঁশের লাঠি নিয়ে তাদের দিকে ছুটে যান - 'এখানে কিসের দরকার? যাওনা, নিজের কাজে যাও। এখানে দাঁড়াবে না, তাহলে লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব। যাও, বেরোও, দূর হও সামনে থেকে।' গ্রামের লোকেরা

তাঁকে পাগল ভেবে প্রতিবাদ না করে চলে যেত। কিন্তু গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা সেটা মানবে কেন ? তাদের তো প্রতিবাদ করার বয়স হয়েছে। তারা ইচ্ছে করে ওঁর বাগানে ঢোকার বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত — ও পাগল বুড়ো, দেখো তোমার বাড়িতে আমরা ঢুকছি। তোমার বাগানের সব ফুল, সবজী নিয়ে চলে যাব।

ওমনি পাগল বুড়োটা তাঁর বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে যথারীতি চিৎকার শুরু করে দিত — বেরিয়ে যা এখান থেকে। দূর-হ।

ছোট ছেলেমেয়েরা বলত — বেরোব কেন শুনি ? রাস্তা কি তোমার কেনা ? রাস্তা সকলের। বেশ করেছি এখানে দাঁড়িয়েছি। বাগান বুড়ো, পাগলা বুড়ো ক্ষেপেছে, ক্ষেপেছে। দুয়ো, দুয়ো কি মজা, কি মজা বলে সবাই হাতে তালি দিয়ে নাচতে থাকে। এভাবেই দিন যায়, রাত যায়, মাস-বছর চলে যায়............ ।

হঠাৎ একদিন সকালে বাইরে কিছু মানুষের কথাবার্তার আওয়াজে পাগলা বুড়ো অন্যান্য দিনের মতো লাঠি নিয়ে তাদের দিকে তেড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, গণ্যমান্য কেউ বলেই মনে হয়, ইশারায় পাগলা বুড়োকে ঘরের ভেতর যেতে বললেন।

কি মনে করে পাগলা বুড়ো রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

ঐ বয়স্ক ভদ্রলোক, সঙ্গের লোকজন এবং গ্রামের মাতবর গোছের লোকেদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে, পাগলা বুড়োর ঘরের দিকে গেলেন। বাইরে থেকে গ্রামের লোকেরা চিৎকার করে বল্‌ল — আপনিও কি পাগল হয়ে গেলেন ! ওর ঘরে ঢুকলে হয়তো রামদা দিয়ে আপনার গলাটাই কেটে দেবে। পাগলের কাণ্ড, কিছু বলা যায়না। ওই ভদ্রলোক হাত নেড়ে তাদের অভয় দিয়ে পাগলা বুড়োর ঘরে ঢুকলেন।

— কি দাদা, চিন্‌তে পারছেন ?

— না, আমি কাউকে চিনি না। চিন্‌তে চাইও না। কেন ঢুকেছেন আমার ঘরে ? বেরিয়ে যান।

— আপনি যখন রাইটার্সে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, আমি তখন সবে চাকরিতে ঢুকেছি। এখন প্রমোশন হয়েছে। গেজেটেড র‍্যাঙ্কে আছি। বিভিন্ন এন.জি.ও-র কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছি। আমরা বীরভূমে বিভিন্ন দুরবস্থার মধ্যে পড়া অসহায় পুরুষ-মহিলাদের দুর্গতির কারণ ও তার প্রতিকার করার জন্য ফিল্ড সার্ভে করতে বেরিয়েছি।

বর্তমানে রামপুরহাট মহকুমা অঞ্চলে কাজ করছি। এই গ্রামে এসে শুনলাম — একজন পাগলা বুড়ো থাকে। বাইরের লোক দেখলে লাঠি নিয়ে তাদের তাড়া করে। কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না। তবে সে খুব ভালো ফুল, ফলের বাগান করেছে তার অল্প জমিতে। তখনই আমার মনে হয়েছিল — যে ভালো ফুলের বাগান করে, সে কখনোই পাগল হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে সেয়ানা পাগল। পাগল সেজে থাকে-লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবার জন্য। দেখলাম — আমার অনুমান সত্যে পরিণত হ'ল। আপনাকে এখানে এ অবস্থায় আবিষ্কার করবো ভাবতে পারিনি।

— আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম ভাই, এই অজপাড়াগাঁয়ে পাগলাবুড়ো সেজে থাকতে হবে। মাঝেমাঝে খুবই বিরক্ত লাগে।

— কেন এমনভাবে এখানে চলে এলেন ?

— সে এক করুণ কাহিনী..........

আমি যখন অবসরগ্রহণ করি তখন বাড়িতে আমার রুগ্না স্ত্রী ও বেকার যুবক ছেলে। মেয়ের ভালো বিয়েও দিয়েছি। একদিন রাত্রে ছেলে আমাকে ব্যবসা করার জন্য এক লাখ টাকা চাইল। আমি দিতে না চাওয়াতে-আমাকে পরোক্ষভাবে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিল। সেদিন সারারাত ভয়ে, অশান্তি, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়ে ভোরবেলা পোস্টমাস্টার মশাই এর বাড়িতে গিয়ে আমার ও আমার স্ত্রীর নামে পোষ্ট অফিসের এম.আই.এস.-এর সুদ যেন প্রতিমাসে আমার অবর্তমানে পোস্টমাষ্টারমশাই আমার স্ত্রীকে দেন সে ব্যবস্থা করে এলাম। সেই সুদে অন্তত: মা আর ছেলের ভাত-কাপড়টা জুটবে। যে ব্যাঙ্কে আমার পেন্‌শন্ জমা হয় - এখানে আসার পর তাদের একটা চিঠি লিখলাম যাতে প্রতি মাসে তাদের রামপুরহাট শাখায় আমার অ্যাকাউন্টে পেনশনের টাকাটা পাঠিয়ে দেয়। আমি প্রতিমাসে এখন ব্যাঙ্ক থেকে নিয়মিত পেনশন তুলে থাকি। শ্রীরামপুর ট্রেজারী অফিসেও জানিয়ে দিয়েছি, আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী যেন বিধবা পেনশনটা ঠিক সময়েই পায়। অফিসেও জানিয়ে দিয়েছি। তবে, আমার এই অজ্ঞাতবাসের ঠিকানাটা কাউকে বলিনি। পাগলার ভান করি বটে, তবে অনেক শান্তিতে আছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি — আমার মতো অবস্থা আর কোন বাপের যেন না হয়। অনেক জ্বালা এই বুকটাতে নিয়ে ঐ ফুলগুলোকে দেখে বেঁচে আছি.........

ছায়াসঙ্গী

সলিল বাবুর মনটা আজ অলস হয়ে পড়েছে। একটা বিরাট শূন্যতা। বাইরের খোলা বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে বসে উদাস চোখে ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন। গত পরশুদিন তাঁর স্ত্রী সীতার পরলৌকিক কাজকর্ম শেষ হয়েছে। গত চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে হঠাৎ এম ন শূন্যতা আসবে সলিলবাবু স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন নি।

ওনার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েটি বড়, ছেলেটি ওর দিদির থেকে পাঁচ বছরের ছোট। ছেলের নাম স্বপন, মেয়ের স্বপ্না। সীতা নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলেমেয়েযের নামকরণ করেছিলো।

স্বপ্না দিল্লিতে থাকে। ওর স্বামী সরকারের বড় আমলা। স্বপ্না নিজে ওখানে একটা বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায়। ওর ছেলে সায়ণ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ক্লাস ফাইভে পড়ে। বাংলায় কথা বলতে পারে কিন্তু অক্ষরজ্ঞান নেই। কারণ ওদের স্কুলে ইংরাজী আর হিন্দিতে পড়ানো হয়। বর্তমানে বাংলা পড়ার কোন সুযোগ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় দিল্লিতে অনেক স্কুলে বাংলা পড়ানো হ'ত। এখন সেটা গল্প।

স্বপন মুম্বাইতে একটা অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ। সবে ছ'মাস হলো বিয়ে করেছে, নতুন বৌ নিয়ে ওখানেই থাকে।

ঠাকুর্দার তৈরি করা পুরোনো বাড়িতে সলিলবাবু ও তাঁব স্ত্রী সীতা চল্লিশ বছর একসঙ্গে কাটালেন। এখন শূন্যতায় ভরা এই বিশাল বাড়িটায় একা থাকাই কষ্টকর। তবু সীতার স্মৃতি এই বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে। ছেলে, মেয়ে ওদের নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু উনি রাজি হননি। যে কটা দিন বেঁচে থাকবেন, সীতার স্মৃতিঘেরা নানা কথার মধ্যেই থাকতে চান।

স্বপনের বিয়ে দিয়ে সীতা ভেবেছিলো, ছোটবেলা থেকে সংসারের পিছনে অনেক পরিশ্রম করেছেন, এবার বৌমা এলে হয়ত খানিক বিশ্রাম পাবে। কিন্তু ছেলের কর্মস্থলে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হওয়ার কারণে বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই বৌমা মুম্বাই পাড়ি দিল।

সলিলবাবুর বাড়িতে একজন ঠিকা কাজের মাসি আছে। সে সকালে-বিকেলে বাসন মাজা ছাড়া, ঘরগুলো ঝাঁট দেওয়া ও মোছার কাজও করে। ফলে ঠিকা লোকের পিছনে তাকে ভাত খাওয়ানো অথবা বাড়িতে তার রাত্রিবাস করার ঝামেলা নেই।

প্রায় ছমাস আগে যখন সলিলবাবু ছেলের বিয়ে দেন, তখন দিল্লি থেকে তাঁদের মেয়ে স্বপ্না এসে প্রায় দিন পনেরো ছিল। একদিন স্বপ্না তার মাকে বলল — সারাদিন

সংসারের পিছনে খাটতে খাটতে তোমার তো শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। রক্তও কম মনে হচ্ছে। এখন তোমার বয়স হচ্ছে একটা রান্নার লোক রাখ-দুবেলা এসে রান্না করে দিয়ে যাবে।

—না মা, সেটা সম্ভব নয়।

— কেন সম্ভব নয় শুনি। তোমাদের দুজনের রান্না করতে বড়জোর পাঁচ-ছশো টাকা নেবে। এখানে কাজের লোক দিল্লির চেয়ে অনেক কম পয়সায় পাওয়া যায়।

—না মা, তা হয় না।

— কেন হয়না, বাবা কি পেনশন থেকে পাঁচ-ছশোটাকা খরচা করতে পারবে না। আমাদের পিছনে তো টাকা খরচা করতে হয় না। ভাই আর আমি দুজনেই রোজগার করি। বাবার পেনশন থেকে দিতে যদি কষ্ট হয় তাহলে, আমি প্রতি মাসে ছশো টাকা পাঠিয়ে দোব। কিন্তু রান্নার লোক তোমায় রাখতেই হবে। কোন ওজর-আপত্তি শুনব না। এই বয়সে তোমার আর বাবার বিশ্রামের প্রয়োজন। মাঝে মাঝে বাইরে কোথাও বেড়িয়ে এসো, যেমন আমার অথবা ভাইয়ের কাছে-কিংবা অন্য কোনও ভাল জায়গায়। মনটা তোমাদের ভাল লাগবে।

সীতাদেবী লজ্জাবনত মুখে কুন্ঠা ও দ্বিধার সঙ্গে বললেন—

— রাঁধুনি রাখতে পারবো না, কিছু মনে করিসনি মা। তোর বাবা আমার হাতে ছাড়া কারুব হাতে খেতে পারে না। যবে থেকে এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছি, রান্নার দায়িত্বটা তখন থেকেই আমার। তুই মা এ বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি করিস না।

স্বপ্না রেগে গিয়ে বল্ল— যা খুশি কর। আমার ভাল কথা, পরামর্শ তো তোমরা নেবে না।

—না মা, এটা এতদিনের দাম্পত্য জীবনের একটা অনুভূতির ব্যাপার, তুই ছোট, এখন বুঝবি না, আমার মত বয়স হলে তখন বুঝতে পারবি।

— আমি তোমায় বলে যাচ্ছি এই বয়সে এত পরিশ্রম করে শরীর খারাপ হলে আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না। আমি দিল্লি থেকে স্কুল কামাই করে যখন তখন এখানে আসতে পারবো না।

সলিলবাবু, স্বপ্না আর ওর মার কথোপকথন ঘরের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। মেয়ে তো অবুঝ, ও তো জানে না সীতার রান্নার তাকে বিভিন্ন ফোড়ন, মশলার সঙ্গে তার স্বামীর জন্য আদর, যত্ন, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। যেটা

মাসমাইনের রাঁধুনির পক্ষে সম্ভব নয়। সলিলবাবুর মনটা, সীতার কথায় তৃপ্তিতে ভরে উঠল। নিঃশব্দে ওখান থেকে প্রস্থান করলেন।

গত পরশুদিন দুপুরে সলিলবাবুর স্ত্রীর পারলৌকিক কাজ (নিয়মভঙ্গ) মিটেছে। ছেলে, বৌমা, মেয়ে, জামাই, নাতি ক'দিন এখানে কাটিয়ে গতকাল যে যার কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। গতকাল সন্ধ্যায় ওরা চলে যাবার পর ফাঁকা বাড়িটাকে শূন্যতা গ্রাস করল। সলিলবাবু সারারাত বিছানায় ছটফট করেছেন, মাঝে মাঝে এক গ্লাস করে জল খাচ্ছেন, বাথরুমে গিয়ে প্রস্রাব করে ঘাড়ে, মুখে, জল দিয়ে ধুয়ে আসছেন। কোনসময় বাইরের বারান্দায় অস্থির পায়ে খানিকটা পায়চারী করে আবার হতাশ হয়ে সীতাহীন শূন্য বিছানায় বালিশটা আঁকড়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করছেন। ঘুম কিছুতেই আসছে না। এ এক মহা ঝামেলা হ'ল। নানা টুকরো কথা, ঘটনা, স্মৃতি চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে। প্রায় চল্লিশ বছর হ'লো, তাঁদের বিয়ে হয়েছিলো। এতদিন বাদে হঠাৎ জুটিটা এত নির্মমভাবে ভেঙ্গে যাবে তা ভাবলেও মনটা যন্ত্রণায়, দুঃখে মোচড় দিয়ে ওঠে। এত চেষ্টা করেও সলিলবাু কিছুতেই চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না। কত টুকরো টুকরো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। বিয়ের দিনের সেই নববধূর সাজে সজ্জিতা সীতাকে সত্যিই মনে হচ্ছিল — রামায়ণ মহাকাব্যে দশরথ রাজার পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা দেবী। মা বলেছিলেন — খোকা দেখ্ তোর জন্যে মা লক্ষ্মীকে স্বর্গ থেকে এনে তোর হাতে তুলে দিয়েছি। যত্ন করিস। কোনদিন আমার বৌমা যেন কষ্ট না পায়।

এমন সময় ঘরের জানালার বাইরে পাল্লার ওপর একটা কাক কর্কশ স্বরে কা-কা করে ডাকতে শুরু করেছে। সলিলবাবুর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সকাল হয়ে গেছে, এখন বিছানা থেকে উঠে পড়া যাক্। নির্জন বাড়িতে এখন তিনি সম্পূর্ণ একা। সীতার স্মৃতির বৃত্তে কতদিন যে ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে? সলিলবাবু বাথরুমে গিয়ে মুখটা ভাল করে জল দিয়ে ধুলেন। ঘাড়েও জল দিলেন। তারপর পেস্টের টিউব থেকে খানিকটা মাজন নিয়ে ব্রাশ দিয়ে ভাল করে দাঁত ব্রাশ করতে যাবেন এমন সময় আপনমনে হেসে উঠলেন। এত দুঃখের মধ্যে আবার সীতার কথা মনে পড়লো। অবসরগ্রহণের পর একদিন সীতা গরম চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে এসে সলিলবাবুর ঘুম ভাঙালেন। ঘুম থেকে উঠে সলিলবাবু সীতার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিতে যাবেন — এমন সময় সীতা কপট রাগ দেখিয়ে বল্ল — দাঁত মেজেছো ?

— না। এখন তো রোজ নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে বেরুনোর তাড়া নেই। তাই এবার থেকে

সবই অনিয়মে চলবে। দাঁতটা বেলাতেই মাজবো। সাহেবরা মর্নিং টি দাঁত না মেজেই পান করে।

— তুমি কি সাহেব নাকি ? না বাপু, আমি যদ্দিন বেঁচে আছি সেটা হবে না। আমি চায়ের কাপ চাপা দিয়ে রাখছি। তুমি তাড়াতাড়ি দাঁত মেজে এসো। সীতা সব বিষয় খুব নিয়ম মেনে চলত। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। অনিয়ম-বেনিয়ম একেবারে পছন্দ করতো না।

একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সলিলবাবু সবে বিছানায় শুয়েছেন, পাশে সীতা। হঠাৎ সে হাসতে হাসতে সলিলবাবুকে বললো — কতদিন আর আমার ভরসায় থাকবে ? এখন থেকে কিছু কিছু বাড়ির কাজ শিখে নাও-যেমন চা তৈরী করা, ছোটখাট রান্না করা, কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত।

— তুমি যদ্দিন আছ তার কোন প্রয়োজন নেই।

— আমি যদি তোমার আগে চলে যাই তাহলে তোমার তো অসুবিধা হবে। তাছাড়া আমার তো বয়স হচ্ছে-দু'তিন দিন তো জ্বরেও পড়তে পারি, অথবা ছেলেমেয়ের কাছে বেড়াতেও যেতে পারি। তুমি কোন কাজ করতে পারনা বলে আমি তোমাকে ফেলে কোথাও একদিনের জন্যও যেতে পারিনা। চল্লিশটা বছর এই সংসারে বন্দী।

— কেন ? যখন অফিসে কাজ করতাম তখন তো তোমাকে, ছেলেমেয়েকে নিয়ে দু'বছর অন্তর সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছি। আর এখন উল্টোপাল্টা বক্‌ছ যে চল্লিশ বছর এই সংসারে বন্দী।

— তুমি তো গ্যাসও জ্বালাতে পার না। কতলোকের স্বামীরা ভোরবেলায় উঠে তার স্ত্রীকে চা করে খাওয়ায়। এক-আধদিন তো আমারও ইচ্ছে হয়।

— আমার গ্যাসের উনুন জ্বালাতে খুব ভয় করে। যদি কিছু উল্টোপাল্টা করে ফেলি তাহলে বাড়িতে আগুন লেগে যাবে।

বাথরুম থেকে এসে সলিলবাবু কেটলীতে এক কাপ জল ভরলেন। তিনি লিকার চা খান, ফলে দুধের বালাই নেই। চায়ের কাপে দেড় চামচ চিনি দিলেন। এবার গ্যাসের ওভেনের সুইচটা দুবার জ্বালাতে গিয়ে তিনবার ভয়ে পিছিয়ে এলেন। শেষকালে যা হবার হবে ভেবে মরিয়া হয়ে স্যুইচটা জ্বালাতে যাবেন এমনসময় তাঁর মনে হল একটা অস্পষ্ট, হাল্কা, সাদা মত হাত, তাঁর হাতের উপর দিয়ে এসে গ্যাসের উনুনটা জ্বালিয়ে দিল। তিনি চম্‌কে উঠে ভাবলেন — এ আবার কি কাণ্ড। নিশ্চয়ই মনের ভুল। সারাবাত ঘুম না হওয়ার জন্য

বোধহয় এইরকম অনুভূতি হচ্ছে। গ্যাস ওভেন নিভিয়ে, কেটলী নামিয়ে আধ চামচ চা পাতা দিয়ে একটু ভিজিয়ে রাখলেন। তারপর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে কাপের মধ্যে চিনি চামচ দিয়ে নাড়তে লাগলেন। চা তৈরী। এবার একটা প্লেটে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট নিয়ে শোবার ঘরে এসে বিছানায় আয়াস করে বসে সবে চায়ের কাপে চুমুক দেবেন এমন সময় দেওয়ালে টাঙানো তাঁদের বিয়ের ছবিত চোখটা আটকে গেল। মনে হল, সীতার চোখ দু'টো সজীব, জ্বলজ্বল করছে আর সীতা তার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসছে। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো — শেষ পর্যন্ত চা বানাতে শিখলে তো ?

অধিকার

দক্ষিণ কোলকাতার মধ্যবিত্ত চাটুয্যে পরিবারে সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করে। সঙ্ঘমিত্রা ছোটবেলা থেকেই খুব হিসেবি মেয়ে। এটা ওর জন্মগত প্রতিভা। ওর অভিধানে আবেগের কোন স্থান নেই। যখন ৩/৪ বছর বয়স তখন বাবার বন্ধুরা কেউ যদি বলত -একটা টফি দোব, ভাল করে একটা নাচ দেখাও তো। ও সঙ্গে সঙ্গে বলতো আগে টফি দাও তারপর নাচ দেখাবো। এই ভাবেই ওর বেড়ে চলা অথবা বড় হওয়া। বাবা, মা, দুই দাদা ও নিজে আব ওর ছোট বোন শমিতা। চার ভাইবোনের মধ্যে ও বুঝে গিয়েছিল, দেয়া-নেয়ার মধ্যেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। সেজন্যই সকলে মিলে যখন খেতে বসত তখন ছোট বোন শমিতাকে বলত — 'তুই ছোট মেয়ে, মাছের কাঁটা বাছতে পারবি না। আমায় দিয়ে দে। তোকে আমি আমার পুজোর জামাটা পরতে দেব।' মা শুনে বকাবকি কবতেন। দাদারা এসব বিষয়ে মাথা ঘামাত না। বাবা ও দাদাদের প্রশ্রয়ে সঙ্ঘমিত্রা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে লাগল। ও বুঝেছিল, জীবনে স্বাধীনভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে গেলে ভালভাবে পড়াশোনা করা খুব জরুরী। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে কোলকাতার একটা নামিদামি কলেজে অর্থনীতি (Economics)-তে অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। ও সব বিষয়েই খুব হিসেবী, অর্থের ব্যাপারে আরও হিসেবী। সেই কারণে অর্থনীতিতেই সে অনার্স নিয়ে পড়তে চাইল। বিজ্ঞান বিষয়ে ভাল নম্বর পেলেও পদার্থ অথবা রসায়ন বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়ল না।

কলেজে প্রবেশ করেই চালাক মেয়ে সঙ্ঘমিত্রা বুঝে গেল যত ভাল ছাত্রীই হোক না কেন, ভাল রেজাল্ট করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা, কলেজের অধ্যাপক/অধ্যাপিকা এবং কলেজের অফিস কর্মচারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। শুধু ভাল করে পড়াশোনা করলে চলবে না। প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গেলে সরে যেতে হবে। এইভাবে চলতে গিয়ে কতগুলো স্লোগান অন্তরে গেঁথে ফেললো — লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই করে পেয়েছি যা, লড়াই করেই রাখব তা। মানসিকভাবে পুরো লড়াকু সৈনিক বনে গেল। জীবনে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে যা কিছু প্রতিবন্ধকতা আসুক তাকে পদদলিত করে, ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে এগোতে হবে। থেমে যাবার বা পিছিয়ে পড়ার কোন ব্যাপার নেই।

কলেজের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ওর বোধোদয় হ'ল নিম্নবর্ণের পদবি না থাকলে

ভবিষ্যতে চাকরি অথবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে ও বঞ্চিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে এলেন ড. মানব মাণ্ডি। খুবই ভদ্র, সপ্রতিভ চেহারা, সুন্দর সুস্বাস্থ্য, মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল-তবে রঙটা একটু চাপা। মানববাবু পড়ান খুব ভালো। আস্তে আস্তে কথা বলেন। সঙ্ঘমিত্রার আজকের পরপর দুটো ক্লাস অফ্ থাকায় লাইব্রেরী গেল জরুরী কিছু নোট করার তাগিদে। ও যখন লাইব্রেরীয়ানকে নির্দিষ্ট বইটির কথা জানালো তখন ভদ্রলোক বললেন — ড. মাণ্ডি বইটি নিয়েছেন, এখন পাওয়া যাবে না। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসবার সময় লক্ষ্য করল, বিশাল পড়ার টেবিলের এককোণে খুব মনযোগ দিয়ে ড. মাণ্ডি বইটি পড়ছেন।

— স্যার, আপনার বইটা পড়তে আর কত বাকী ?

— কেন ?

— আমার ঐ বইটার খুব প্রয়োজন, দুটো ক্লাস অফ্ আছে, কিছু নোট করতাম।

সঙ্ঘমিত্রা এটুকু ভাল শিখেছে ছাত্রী যদি অধ্যাপকের কাছে কিছুক্ষণের জন্য কোন বই পড়ার জন্য চায় খুব অভদ্র না হলে তিনি দেবেন। ও তো হিসেবী মেয়ে, তাই চক্ষুলজ্জা না করেই ড. মাণ্ডিকে প্রশ্নটা করল।

ড. মাণ্ডি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। অধ্যাপক যখন নিজস্ব পড়াশোনা করছেন তখন একটা ছাত্রী তাঁকে বিরক্ত করে এভাবে প্রশ্ন করতে পারে তিনি ভাবতেই পারছেন না। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে তিনি ওর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে ধীর পদক্ষেপে লাইব্রেরীয়ানকে ঐ বইটা জমা দিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্ঘমিত্রা এই সুযোগটাই খুঁজছিল। সে তৎক্ষণাৎ বইটা নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে পড়ার টেবিলে বস্‌ল। স্বগতোক্তি করে মনে মনে হেসে বল্‌ল — আমার সঙ্ঘমিত্রা নামটা সার্থক। আমি কারুর মিতা নই, একমাত্র নিজের ছাড়া। আমাকে এখনও প্রফেসর মাণ্ডি চিন্‌তে পারেনি এটাই আফসোস্। ভবিষ্যতে কপালে কি আছে কে জানে ?

একদিন সঙ্ঘমিত্রা ড. মাণ্ডিকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে,

— স্যার আপনার বাড়ি কোথায় ?

— বীরভূমের এক প্রত্যন্ত গ্রামে।

— এখানে কোথায় থাকেন ?

— কেন ?

— না এমনিই। আপনি তো নতুন এসেছেন, সেইজন্য আরকি। যদি না বলতে

চান-বলবেন না। জোর করব না। ভাবলাম, যদি কোন পড়া আটকে যায় তাই।

—— তুমি কোথায় থাক ?

—— আমি হাজরা পার্কের কাছে একটা ব্যাচিলর মেসে থাকি।

—— ব্যাচিলর মেস কেন ? এখনও বুঝি বিয়ে করেন নি ?

সঙ্ঘমিত্রা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে।

ড. মাণ্ডির লাইব্রেরীতে প্রথম সাক্ষাতে মেয়েটাকে পছন্দ হয়নি। কিন্তু তার পড়াশোনার ঝোঁক এবং চটকদারী ফর্সা রঙের সুন্দর চেহারার জন্য একটু ভাললাগার পরশ লাগছে। সঙ্ঘমিত্রাও জানে কিভাবে বিপনন্ বাড়াতে গেলে চটক্‌দারী এ্যাডের প্রয়োজন-সেই কারণে ছোটবেলা থেকেই যোগ সেন্টারে বাড়ির অমতে নিজে থেকেই ভর্তি হয়েছিল। তন্বী, সুশ্রীদের সুন্দর চেহারাটা ফসল। ও জানত ভবিষ্যতে নিরোগ, সুন্দর চেহারার প্রয়োজন। ফেসিয়াল বা বিভিন্ন ক্রীম মেখে সেটা হবে না। লিভার ভাল রাখতে ভাজা জিনিস এক্কেবারে খেত না। সারাদিনে অন্তত ছয় লিটার জল খেত। ঋতু অনুযায়ী দুটো ফল খেত। রাত্রে বাড়িতে অনেকে ভাত খেলেও ও আটার রুটি খাওয়ার বায়না করত। ময়দা অথবা ফার্স্ট ফুড মুখে দিত না। সেই হিসেবেও খুব সংযমী মেয়ে।

ড. মাণ্ডির কাছে পড়া বোঝবার অছিলায় প্রায়ই সঙ্ঘমিত্রা ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হওয়ার সময় হয়ে এল। যত পরীক্ষা এগিয়ে আসে ততই সঙ্ঘমিত্রা ড. মাণ্ডির ঘনিষ্ঠ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে অথবা বাইরে কোন রেস্তোরাঁয়। ড. মাণ্ডি আর তাকে সঙ্ঘমিত্র না বলে মিতা বলে ডাকেন। মিতাও ড. মাণ্ডিকে তুমি সম্বোধন করে, তবে কারুর সামনে আপনিই বলে।

—— মিতা পরীক্ষা দেওয়ার পর কি করবে ভাবছো ?

—— এখনও ঠিক করিনি। রেজাল্ট বের হবার পর চিন্তাভাবনা কোরব। তবে যতক্ষণ রেজাল্ট না বেরোচ্ছে শর্ট কোর্সে কোন ভাল কম্পিউটার শেখার ক্লাসে ভর্তি হব। রিসার্চ করতে গেলেই কম্পিউটার শেখাটা কাজে লাগবে।

মিতা পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজোর ছুটি পড়ে গেছে। ড. মাণ্ডি দেশের বাড়ি গেছেন বাবা, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

হাওড়া থেকে রাত্রের ট্রেনে চেপে সিউড়ি স্টেশনে ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমে ড. মাণ্ডির খুব গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে হ'ল। মনে হল ইচ্ছে ডানায় ভর করে উড়ে উড়ে গ্রামের বাড়ি পৌঁছে যাই। স্টেশন থেকে দুবরাজপুরের বাসে চেপে ঘন্টাখানেক যাবার পর

বাস থেকে নেমে মোরাম বিছানো রাস্তা ধরে এক ক্রোশ হাঁটলেই বাড়ি। আগে আলপথ ধরে হাঁটতে হোত। কিছু দিন হলো গ্রাম পঞ্চায়েতের কল্যাণে মোরাম রাস্তা হয়েছে। মাঝেমধ্যে ভ্যান রিক্সাও পাওয়া যায়। এখন আর ড. মাণ্ডির তর সইছে না ভ্যান রিক্সার জন্য অপেক্ষা করার। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গ্রামের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। এখানে গ্রামের খোলা হাওয়ায়, মাটির গন্ধে শহরের বাইরের খোলস পরা অধ্যাপক ইমেজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কতদিন পর বাবা, মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। বাবা হারাণ মাণ্ডি ভূমিহীন কৃষক। বর্গা চাষী। এখন অবশ্য ছেলের কল্যাণে সামান্য কিছু জমি হয়েছে। গ্রামের মাতব্বর হিসেবে সালিশী সভায় মাঝে মাঝে যুক্তি পরামর্শ দেওয়ার জন্য ডাক পড়ে। মা দুলু রাণী মাণ্ডিকে কতদিন দেখেননি। কতদিন নিজে না খেয়ে পুকুর থেকে শাক পাতা জলে সেদ্ধ করে খেয়েছেন-কিন্তু ছেলের বাবাকে আর ছেলেকে বুঝতে দেননি। যেদিন হারাণ অথবা হারু মাণ্ডি অন্যের জমিতে জন খাটতে যেতেন সেদিন ঐ জমির মালিক হারুকে দিন মজুরীর সঙ্গে এক কিলো চাল দিতেন। আর যেদিন কাজ হত না সেদিন ভোরবেলা শহরে গিয়ে মুটে-মজুরের কাজ করতেন।

এই গ্রামে বন্যা ও খরার প্রকোপ খুব বেশী। মানববাবু যখন খুব ছোট তখন থেকেই তার বুদ্ধির প্রকাশ পেয়ে গ্রামের লোক অবাক বিস্ময়ে সান্ধ্য আড্ডায় আলোচনা করত। ঐ গ্রামে তখনও বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয়নি। বিকেলে হাত মুখ ধুয়ে হাঁড়িয়ার সঙ্গে পান্তাভাত লঙ্কা দিয়ে খেয়ে ঘন্টাখানেক হারু মাণ্ডি গ্রামের চণ্ডী মণ্ডপের আড্ডায় কাটিয়ে বাড়ি এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তেন। ছেলে কিভাবে পড়াশোনা করবে, কিভাবে ভবিষ্যতে রোজগার পাতি করবে তার চিন্তা ছিল না।

একদিন চণ্ডীমণ্ডপের সান্ধ্য আড্ডায় হারু মাণ্ডিকে দু-একজন বল্লেন — তোমার ছেলের এত বুদ্ধি, তা তাকে শহরে ভাল কোনও স্কুলে ভর্তি করে দাও। হারু বলে — আমি সারাদিন পেটের ভাতের জোগাড়ের জন্য ঘুরি। আমার অত সময় নেই ছেলেকে শহরে নিয়ে যাবার। একটু মাতব্বর গোছের একজন, জীবনবাবু বল্লেন — আমি তোমার ছেলেকে শহরে নিয়ে যাব দুদিন বাদে। ছেলেকে তৈরী হয়ে থাকতে বোলো।

জীবনবাবু মানববাবুকে নিয়ে সিউড়ী রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজকে গিয়ে প্রণাম করে বল্লেন — মহারাজ এই ছেলেটাকে যদি আপনার চরণে স্থান দেন তাহলে খুবই উপকার হয়। গরিব ঘরের ছেলে-টাকা পয়সা দিয়ে পড়ার অবস্থা নয়। খুব বুদ্ধি। দেখবেন একদিন স্কুলের ও আমাদের গ্রামের মুখ রাখবে।

মহারাজ তখন স্কুলের এক মাস্টারমশাইকে ডেকে বল্লেন, ... তো ছেলেটাকে পরীক্ষা করে কোন ক্লাসে ভর্তি করা যাবে। কিছুক্ষণ পরে ঐ মাস্টারমশাই এসে মহারাজকে বল্লেন-ও ক্লাস টু-তে পড়ার উপযুক্ত-কিন্তু বয়স অনুযায়ী ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করতে পারেন। তবে ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান। তখন মহারাজ ঐ ভদ্রলোককে বললেন — আজ বুধবার, সামনের সোমবার সকাল নটার মধ্যে ওর বাবা, মার সঙ্গে, ওর যা জামাকাপড় আছে নিয়ে আসতে বলবেন। স্কুলের পড়াশোনা, জামাকাপড় সব আমরাই দেব। ও শুধু আশ্রমের নিয়ম মেনে ভালোভাবে পড়াশুনা করবে।

জীবনবাবু খুব খুশি হয়ে মানববাবুকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে সবাইকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন — দেখ, আমি হারুর ছেলের একটা ভাল ব্যবস্থা করেছি। ও ভবিষ্যতে আমাদের গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমি হয়তো তখন বেঁচে থাকবো না। তোমরা যারা থাকবে তারা আমার কথাটা মিলিয়ে নিও।

মানববাবু দেশের মাটিতে পা দিয়ে জীবনবাবুর জন্য খুবই ব্যথিত। উনি তিন-চার বছর হ'ল স্বর্গলোকে বিচরণ করছেন। এত পরোপকারী মানুষ মানববাবু জীবনে কোনদিন দেখেন নি। মনে মনে তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বাবা, মার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা দিলেন।

মানববাবু ঘরে ঢুকে দেখেন তার বাবা হারু মাণ্ডি অসুস্থ। গায়ে কাঁথা চাপা দিয়ে খাটিয়ায় চোখ বুজে শুয়ে আছেন। মা দুলু মাণ্ডি ঐ ঘরের পিছনে দিকের উঠোনে কাঠ দিয়ে মাটির উনুনে ভাত সেদ্ধ বসিয়েছেন। বাবাকে ঘুম থেকে না তুলে মার পিছনে গিয়ে ডাকতেই মা ডাক শুনে দুলু মাণ্ডি চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে দেখেন-স্বপ্ন নয়, সত্যিই তাঁর আদরের ছেলে এসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি শাড়িতে হাতটা মুছেই ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন। ছেলেও খুশি হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। এখানে মা-ছেলের স্বর্গীয় সম্পর্ক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বড়লোক-গরিব সবই একাকার হয়ে যায় এই মধুর সম্পর্কের কাছে। মা ছেলেকে নিয়ে ঘরে গিয়ে ওর বাবাকে ঘুম থেকে তুলেই আনন্দ সংবাদ জানাতেই হারুবাবু খাটিয়ায় উঠে বস্‌লেন —

— হ্যাঁরে হঠাৎ চলে এলি চিঠি না দিয়ে?

— আমার কলেজে দুর্গাপুজোর ছুটি পড়তেই চলে এলাম। চিঠি দেওয়ার সময় পাইনি। অনেকদিন তোমাদের দেখিনি বলে মনটা খারাপ লাগছিল।

— মা, বাবা একসঙ্গে বললেন — খুব ভালো হয়েছে। মা বললেন কটা দিন

থাক্ । বাবার শরীরটাও খারাপ ।

— বাবা বললেন, তুই এসেছিস — আমি ভালো হয়ে যাব ।

কয়েকদিন বাবা, মার সঙ্গে সানন্দে কাটিয়ে একদিন দুপুরে খাওয়ার পর মানববাবু মাকে বললেন — মা, তুমি, বাবা, হয়ত দুঃখ পাবে, আমি একটা বাঙালী হিন্দু মেয়েকে ভালোবাসি । তাকে বিয়ে করব । আমরা সাঁওতালি মতে বিয়ে করব না । কোর্টের কাগজে সই করে বিয়ে হবে । বাবাকে একটু বুঝিয়ে বোলো, যেন রাগ না করে ।

মা বললেন — আমাদের সমাজ আছে, মোড়লের পরামর্শ নিতে হবে । মোড়লকে না জানিয়ে বিয়ে হলে একঘরে করে দেবে । কিংবা ডাইনি বলে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পুড়িয়ে মেরে দেবে ।

মানববাবু বললেন — আমি কোলকাতা চলে যাবার পর মোড়লকে জানিও । যদি দু-চার হাজার জরিমানা করে সেটা পাঠিয়ে দেবো । আর আমাদের গ্রামের সকলকে পেট পুরে খাইয়ে দেবার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও । ওদের খুশী করে দেব যাতে বাবাকে অথবা তোমাকে কিছু বলতে না পারে ।

কোলকাতায় ফিরে এসে রাত্রে শুতে যাবার সময় মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল মানববাবুর । সাঁওতাল পরিবারের মেয়ে বিয়ে না করে অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করা ঠিক হবে কিনা, বাবা, মাকে সাঁওতাল সমাজ মেনে নেবে কিনা এইসব দুশ্চিন্তার মাঝে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক নেই । সকালের রোদ মুখের ওপর পড়তেই ঘুমটা ভেঙে গেল । এক গ্লাস জল খেয়ে বাথরুমে গেল । স্নান সেরে এসে জামাকাপড় পরছে এমন সময় মেসের বেয়ারা বিহারীলাল গরম এক কাপ চা সঙ্গে দুটো বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল ।

— বাবু চা ।

— টেবিলে রাখ্ । আজ বেলা একটা নাগাদ ফিরব । কিছু কাজ আছে, এখুনি বেরিয়ে যাব ।

— আচ্ছা বাবু, আমি রান্নাঘরে ঠাকুরকে বলে দিচ্ছি ।

মানববাবু চা খেয়ে দরজা বন্ধ করে মেস্ থেকে বেরিয়ে সামনের বড় রাস্তার পাশে একটা পি.সি.ও. বুথ থেকে মিতাকে ফোন করলেন ।

মিতাই ফোন ধরল — হ্যালো, কাকে চাই ?

— তোমাকে । খুব জরুরী দরকার । যত তাড়াতাড়ি পার কফি হাউসে চলে এসো । কারণ ইউনিভার্সিটি খুলতে এখনও এক সপ্তাহ বাকী ।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মিতা চলে এল। মানববাবু বাসস্ট্যাণ্ডে ওর জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মিতাকে বাস থেকে নাম্‌তে দেখে মনটা খুশীতে ভরে উঠল। মানববাবু মিতাকে নিয়ে কফি হাউসের দোতলায় একটা কোন দেখে বসলেন। কলেজ, ইউনিভার্সিটি ছুটির সময় ভীড় খুব একটা থাকে না।

কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে মানববাবু মিতাকে বল্‌লেন — এইভাবে যে আমরা মিলিত হই সেটা অনেকেরই চোখে পড়ছে। অধ্যাপক মহলে চাপা গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়েছে। এর একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এখানে মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। ক'দিন ধরে ব্যাপারটা আমায় খুব ভাবাচ্ছে। ভাল করে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। সেইজন্য আজ সকালেই তোমাকে ফোনে এখানে ডাক্‌লাম। মিতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে চামচটা কফি কাপের মধ্যে নাড়তে লাগল। তারপর ভাবলেশহীন ভাবে বলল — 'এতে নতুন করে তো বলার কিছু নেই। তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন ক্লাসরুমের পরে লাইব্রেরীতে দেখা হ'ল তখনই তো তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

— কিন্তু এভাবে কতদিন থাকা যায়? স্থায়ী সমাধানের কিছু চিন্তাভাবনা কর।

— আমার রেজাল্ট টাতো আর ক'দিন বাদেই বেরোবে। তারপর যা হোক একটা ব্যবস্থা হবেই। কিচ্ছু চিন্তা কোবনা।

— চিন্তা করছি না, কিন্তু ভাবনা পথ আগলে রেখেছে।

— আমার বাড়ি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। সেখানে বাড়ির বড়রা নিশ্চয়ই মত দেবে না। তাদের অমতেই যা কিছু করতে হবে।

মানববাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। মিতার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে বললেন — হেঁয়ালী কোর না, যা কিছু করতে হবে মানে কি? সোজা কথায় কবে রেজিষ্ট্রি বিয়েটা করছ সেটা বল।

— ঠিক সময় মতই জানতে পারবে। এত সহজে ধৈর্য হারালে চলবে না মশাই। শ্রীমার কথায় — "যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে না রয়।"

— বাবাঃ, এযে ভূতের মুখে রাম নাম। তোমার মুখে কোনদিন ঠাকুর দেবতার নাম শুনিনি। কি করে ভাল কেরিয়ার গড়বে তার চিন্তাতেই তো মশগুল থাকো।

— রেজাল্ট বেরোনো অবধি অপেক্ষা কর। আজ চলি। অনেকক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

— কিছুদিন পরে রেজাল্ট বের হতেই সঙ্ঘমিত্রা দেখল প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ

হয়েছে। ৬৭ শতাংশ পেয়েছে। রিসার্চ করার জন্য খোঁজখবর করতে লাগল।

ড. মাণ্ডি মিতার ভাল রেজাল্ট করার খুশিতে ইউনিভার্সিটির ছুটির পর বিকালে পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁয় মিতাকে পেট ভরে খাওয়ালেন।

— মিতা ড. মাণ্ডিকে বললো — তুমি তাড়াতাড়ি একটা ফ্ল্যাট কেনার ব্যবস্থা কর, কারণ তোমার মেসবাড়িতে তো বিয়ের পর উঠবো না। যতক্ষণ ফ্ল্যাট না কিনতে পারছ ততদিন সল্টলেক বা কাছাকাছি অঞ্চলে ভাল বাসা ভাড়া কর কারণ কোলকাতার দক্ষিণে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি থাকবো না। আমার রিসার্চটা যখন শেষ হবে তখন নিশ্চয়ই একটা কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে যাব। দুজনের যৌথ রোজগারে ফ্ল্যাটের ঋণও শোধ হয়ে যাবে।

ড. মাণ্ডি বললেন — ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে একমাস আগে নোটিশ দিতে হবে। তবে চল আজকেই নোটিশটা দিয়ে আসি। শুভস্য শীঘ্রম্।

মিতা বলল — আজ যাবো না, আগামী বুধবারে যাবো, বুধবারে কোন কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বেরলেই সেটা শুভ হয়।

— তাই হোক, তোমার কথাই শিরোধার্য।

মিতা বাড়ি যেতে যেতে বাসের মধ্যে বসে ভাবতে লাগল আর মনে মনে হাস্‌তে লাগল-আমাদের দেশের ছেলেগুলো কি বোকা, আলাপ হওয়া মাত্রই প্রেম নিবেদন করে বসে। তারপর অলীক স্বপ্নে ভাসতে ভাসতে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে তার চিন্তা করে। ছেলে জাতটাই এরকম-সে হকারীই করুক বা অধ্যাপনাই করুক। এদের নাচাতে অথবা ফাঁসাতে বেশী সময় লাগে না।

বুধবার আসতেই মানববাবু লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে দৌড়লেন বাথরুমের দিকে। গতকাল রাত্রে চিন্তায় ঘুম আসছিল না, সেই কারণে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পান নি। উঠতে দেরী হয়ে গেল। অবশ্য আজ ইউনিভার্সিটি যাওয়া নেই। শুধু একটা বন্ধুকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে বিয়ের নোটিশ দিতে যাওয়া।

ভাল করে স্নান খাওয়া সেরে দশটার সময় ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক বন্ধুকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস ওয়েলিংটনে 'হিন্দ' সিনেমার কাছে দোতলায় সাড়ে দশটার সময় হাজির হলেন। মিতাও তার এক বান্ধবীকে নিয়ে পৌনে এগারোটার সময় ওখানে উপস্থিত হ'লো। মিতা আজ খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে, তার সঙ্গে ম্যাচ করা

ব্লাউজ। হ্যাণ্ডব্যাগ ও চটিটাও ম্যাচ করা। মানববাবু চোখ ফেরাতে পারছেন না। এ মেয়েকে ঘরণী করে আনতে পারছেন বলে মনে একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করছেন। ওকে এখন রীতিমত ডাক্সাইটে সুন্দরী বলা যায়। আরও ভাবতে থাকনে — আমাদের বংশে এত সুন্দরী বউ আসেনি, এত লেখাপড়া জানা বউ আসেনি। নিজেকে খুব সুখী ভাবছেন। মনে হচ্ছে যেন রাজ্য লটারীর প্রথম পুরস্কার জিতেছেন।

ঠিক বেলা এগারটায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের সামনে নোটিশে সই-সাবুদ হয়ে গেল। একমাস বাদে বিয়ে। নোটিশ পর্ব চুকিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে আবার পার্ক স্ট্রীট। সেখানে হোটেলে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর্ব চুকিয়ে যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। মেসের খাটে বসে মানববাবু আয়েস করে এক কাপ চা নিয়ে দিনের খবরের কাগজটা পড়তে গিয়েই এক জায়গায় চোখটা আট্‌কে গেল — গড়িয়া অঞ্চলে একটি বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির এম.এ.-র কৃতী ছাত্রী সঙ্ঘমিত্রা চ্যাটার্জী গতকাল সন্ধ্যায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ তার ছিন্নভিন্ন হওয়া দেহটা ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গেছে। সংবাদে আরও প্রকাশ তার ঘর থেকে ঐ দিনের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় লাল কালিতে দাগ দেওয়া কাগজটি পাওয়া গেছে—

"ঐতিহাসিক রায় — বিবাহসূত্রে সংরক্ষণ নয়"

সুপ্রিম কোর্ট আজ এক রায়ে ঘোষণা করেছেন — নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেও তাঁব স্ত্রীর বর্ণ নির্ধারিত হবে উক্ত স্ত্রীর জন্মদাতা পিতার বর্ণের ভিত্তিতে। অতএব ঐ জাতীয় মহিলাদেব ক্ষেত্রে তাঁদের জন্মদাতা পিতার উচ্চবর্ণের জন্মগত অধিকার বহাল থাকবে।

দূরভাষ

সুমন সবে ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠেছে। কলকাতার কাছেই মফঃস্বল অঞ্চলের আধা শহরে থাকে। ফলে ক্লাস নাইন থেকেই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে হবে বলে ওর মা, বাবাকে বলে একটা নতুন সাইকেল কিনে দিল। সুমন খুব খুশী। এতদিন শনিবার বিকালে বাবা-অফিস থেকে ফিরবার পর এবং রবিবার-সুযোগ পেলে বাবার সাইকেল চড়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতো।

একদিন সুমনের মা সুমনকে কাছে ডেকে বললেন — তোমায় নতুন সাইকেল কিনে দিলাম কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে দেখাতে হবে। সুমন উৎসাহ নিয়ে নতুন উদ্যমে আরও ভাল করে পড়াশোনা করতে লাগল। কোচিং-এ পড়তে গিয়ে রত্নার সঙ্গে বন্ধুতা হল। রত্না নিজেও পড়াশোনায় খুব ভালো মেয়ে। সে সুমনকে খুব উৎসাহ দিত।

— সুমন, তুমি পড়াশোনায় এত ভালো, তার থেকেও ভাল তোমার ভদ্র, মার্জিত ব্যবহার। তোমার ভবিষ্যতে অধ্যাপক হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের সব ভাল ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা আশা করেন — তাদের সন্তানরা ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়র হবে। আমি, ভবিষ্যতে তোমাকে ভাল অধ্যাপক হিসাবে দেখতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও অধ্যাপক হবে। তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। সেই কারণে যদি আমার বিশ্বাসভঙ্গ হয় তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।

সুমন বলে-এই তো সবে ক্লাস নাইনে উঠে তোমার সঙ্গে পরিচয়। এখনও মাধ্যমিক পাশ করতে এক বছর বাকি। এখনই কি করে তোমায় কথা দেব, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করতে পারি।

রত্নার দুচোখে মুক্তোর মত দুফোঁটা জল টল্‌টল্ করছে অশান্ত আবেগে সুমনের হাত দুটো ধরে গলার স্বর খাদে নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে-আমি জানি, তুমি পারবে। প্রথম দর্শনেই তোমার প্রেমে পড়েছি। তুমি যাই কর না কেন, আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।

রত্না শোনো - পৃথিবীটা অনেক কঠিন জায়গা। আমরা কোথায় ভবিষ্যতে কি বিষয়ে নিয়ে পড়ব, কি পরিস্থিতি আজ থেকে দশ বছর বাদে দাঁড়াবে সেটা কি আমরা এখনই বলতে পারি ? অবুঝ হোয়ো না। তুমি পড়াশোনায় ভাল মেয়ে। এসব আজেবাজে অলীক কল্পনা করে নিজের পড়ার ক্ষতি কোরো না। তোমার রেজাল্ট যদি মাধ্যমিকে খারাপ হয়,

তাহলে আমিও নিশ্চয়ই খুশি হব না।

ক্রমশঃ ওদের প্রেম, গভীর থেকে গভীরতর হয়। একদিন দেখা বা কথা না হলে জীবনটাই বৃথা বলে মনে হয়। সুমন ও রত্না দুজনেই মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিকে চার-পাঁচটা বিষয়ে লেটার নিয়ে পাশ করল। সুমনের বাবার চাপে সুমন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং দুটো বিভাগের পরীক্ষাতেই পাশ করল। কিন্তু মার কাছে আব্দার করে বলল মা, আমি মানুষ গড়ার কারিগর হব। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হব। তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল। আমি তো জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে দেখিয়ে দিয়েছি আমার যোগ্যতা। মা আমি মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই পড়াশোনা করতে পারব না।

ফলে সুমন বরানগর অঞ্চলে বি.টি. রোড্বে উপর অবস্থিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটে স্ট্যাটিসটিকস্ নিয়ে বি.স্ট্যাট পড়তে লাগল। রত্নাও কেমিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে ওরা উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক অথবা বেথুন কলেজেব উল্টোদিকে হেদুয়ার পুকুরের পাশে বেঞ্চিতে বসে বাদাম ভাজা চিবোতে চিবোতে দুজনেই মনের কথা বলত-নিজেদের ভালবাসা দিয়ে, মন দিয়ে, শরীর দিয়ে।

এক সময় সুমন এম.স্ট্যাটে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে রিসার্চ করতে লাগল। রত্নাও ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতেই এম.এস.সি পাশ করেছে। সুমন যখন রিসার্চ করতে শুরু করল তখন পড়াশোনার অত্যধিক চাপের জন্য মফঃস্বল শহর থেকে বরানগর অঞ্চলে ডানলপ ব্রীজের কাছে সবেদাবাগানে বাসা ভাড়া নিল। বাবা, মাকেও নিয়ে এল নিজের বাসায়। ওর বাবাও এতদিনে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সুমনের রত্নার সঙ্গে যোগাযোগ বা দেখা হওয়ার অবসর কমে গেল-পড়ার চাপের কারণে। শুধু গবেষণা-গবেষণা-গবেষণা। অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ অথবা সময় পেল না সুমন। বেশ কিছুদিন পরে একদিন রবিবার ও পুরনো জায়গায় গিয়ে বন্ধুদের কাছে শুনল-এম.এস.সি পাশ করার পরেই এক বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে রত্নার বিয়ে হয়ে গেছে।

সুমন পি.এইচ.ডি করার পর পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে বনেদী ঘরের শিক্ষিতা সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে ওর বাবা, মা বিয়ে দিলেন। বাবা বললেন-বয়স অনেক হোল, কবে আছি কবে নেই-সুমন, আমার বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তোব বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। আপত্তি

করিস না। সুমনের মা সুমনকে নিয়ে মেয়ে দেখতে গেলেন, ডোভার লেন, বালীগঞ্জে। মেয়ে দেখে ওদের খুব পছন্দ হল। বিয়েটাও খুব শীঘ্র মিটে গেল, কারণ সুমনের বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা সব পাকা। পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর সুমন আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর হাতছানি উপেক্ষা করে দেশে ফিরে এল। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইনস্টিটিউটেই অধ্যাপনা করতে লাগল। ইতোমধ্যে ওর বাবা, মা মারা গেছেন। সল্টলেক অঞ্চলে নিজের বাড়ি। ছোট গাড়িও একটা কিনেছে, অধ্যাপনা করতে যাওয়ার জন্য। ওর একটি মেয়ে। সে এখন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে কেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস.সি. -তে ভর্তি হয়েছে।

সুমনের স্ত্রী দীপাই মেয়ের পড়াশোনার ও অন্যান্য বিষয়ের দেখাশোনা করে। দীপা ওর মেয়ের সঙ্গে বন্ধুর মতই মেশে। সুমন নিজের অধ্যাপনা নিয়েই ব্যস্ত। বাড়ির সব কিছু দীপা, মা দুর্গার মত একাই সামাল দেয়। দীপা রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী বিভাগের বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লেখে। মেয়ের বয়স হচ্ছে, এবার বিয়ের দেবার প্রয়োজন। নিজেদেরও বয়স বাড়ছে। সুমন যখন সকালে বেরিয়ে রাত্রে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে বাড়ি ফেরে, তখন দীপা অজানা ভয়ে ভীত হয়ে ভাবে-সুমন ঠিক আছে তো ? ও খুব চাপা স্বভাবের। শরীর খারাপ হলেও কাউকে কিছু বুঝতে দেবে না। ওর মাথার চুলগুলো অনেক পেকে গেছে। উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে রাশভারী গুরুগম্ভীর ভাব। সুমন যেন কেমন পাল্টে গেছে। দীপা অবাক হয়ে রোজই সুমনকে পর্যবেক্ষণ করে।

একদিন রবিবার সকালে দীপা সুমনকে বললো — জানো, খুব ভাল একটা পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, মেয়ের বিয়ের জন্য। বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ারের একমাত্র ছেলে-দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। খুব বনেদী বাড়ি, শ্যামবাজারে। আজ বিকালে ওনারা মেয়েকে দেখতে আসবেন। বাড়ি থেকে কোথাও বাইরে বেরিয়ে যেও না।

সুমন হাসতে হাসতে বলে-যথা আজ্ঞা দেবী, কর্ত্রীর ইচ্ছাই শিরোধার্য।

বিকাল পাঁচটার পরেই পাত্রপক্ষেরা চলে এলেন, পাত্র তার বাবা মায়ের সঙ্গে এসেছে। দীর্ঘ, সুদর্শন, ফর্সা, খুব স্মার্ট। নজর কাড়া চেহারা। আজকালকার দিনে পাত্র তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেয়ে দেখতে আসে, কিন্তু সে বাবা-মার সঙ্গে এসেছে দেখে সুমনেরও খুব ভাল লাগল। কফি, কেক্, মিষ্টি ইত্যাদিসহ আপ্যায়নের পর পাত্রী দেখা শেষ হলে দীপা পাত্রের মাকে পাশের ঘরে ডেকে বলল — দিদি, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?

পাত্রের মা দীপা বলল - আপনার মেয়ে খুবই রূপসী, অপছন্দ হওয়ার মত নয়। তবে বাড়ি ফিরে আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করে দিন সাতেকের মধ্যে জানাব।

দিন সাতেক বাদে, পরের রবিবার রাত্রে দূরভাষ যন্ত্রটি বেজে উঠতেই সুমন ধরল — হ্যালো, কাকে চাইছেন ? অপর দিক থেকে উত্তর এল — আপনাকে।

আপনি কে বলছেন, বললেন না তো ?

এতদিন বাদে ফোনে গলাটা চিন্‌তে না পারাই স্বাভাবিক। গত রবিবার বিকালে তোমার মেয়েকে যখন দেখতে গেছলাম আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো বলে, তখন আশা করি নিশ্চয়ই চিন্‌তে পেরেছিলে - আমি কে ? তবে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার কথা রেখেছো বলে। নামী অধ্যাপক হয়েছো। কিন্তু তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হতে পারে না, সম্ভব নয়, কারণ সে আমার গর্ভে তোমারই ঔরসজাত সন্তান।

শান্তির সন্ধানে

অধুনা ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের চাঁইবাসায় আজ থেকে প্রায় তিন চার পুরুষ ধরে বসবাস করছে টমাস টুডু। তার পিতা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ঐ সময়কালে সম্পন্ন ভূস্বামীদের অত্যাচারের জন্য। সেইজন্য তার বসতবাড়ি, জমি সবই অক্ষত রাখতে পেরেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে। তাছাড়া বিশেষভাবে সাহায্য পায় সে দেশ ও বিদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠনের মাধ্যমে। তাকে এখন মধ্যবিত্ত বলা যায়। স্ত্রী মারিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বাঁচিতে। খুব সুন্দর দেখতে ছিল মারিয়া। সবসময় হাসিতে ভরে থাকত তার মুখ। শত অসুবিধার মধ্যেও তার নিষ্পাপ সজীব হাসিমুখ দেখে টমাস তার কাজকর্মে প্রেরণা পেত। নতুন করে বিপদ ঠেলে আবার বাঁচার জন্য লড়াই করত। হঠাৎ কিছুদিন আগে কালব্যাধি ক্যানসার তাকে টমাসের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য দূরে সরিয়ে দিল। ফেলে গেল কুড়ি বছরের মার্থাকে, টমাসের দেখাশোনা, সেবাযত্নের জন্য। বুড়ো বয়সে স্ত্রীবিয়োগ অতীব দুঃখজনক। যে সময়ে যৌবন চলে যায় তখন কথা বলার জন্য স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই একে অন্যের পরিপূরক। একজনের বিয়োগ হলে সে ব্যাথা সহ্য করা খুবই কঠিন।

মার্থাও তার মায়ের মত রূপসী। ধীর-স্থির, মুখে সবসময়ে মিষ্টি হাসিটা লেগে আছে। পড়াশোনাতেও ভীষণ ভালো, সঙ্গে গৃহস্থলীর কাজকর্মেও খুব পটু। মার্থা আর তার আবাল্যের সাথী হ্যারিস। সেও দলিতদের একজন। একই ইতিহাস টমাসের মত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে 'মাদার মেরী' ও 'প্রভু যীশু'-র দয়ায় এখন সে একজন ভদ্র, শিক্ষিত (গ্র্যাজুয়েট), স্বাস্থ্যবান যুবক। টমাসের মনের ইচ্ছা, এইবার মার্থা আর হ্যারিসের বিয়ে দেবে। সুন্দর জুটি হবে, মানাবে ভালো। টমাস স্বপ্ন দেখে — শেষ বয়সে নাতি-নাতনি নিয়ে কাটবে ভাল। যে গ্রামের গীর্জায় তার অন্ধকার জীবন আলোয় ভরে উঠেছিল সেইখানেই মেয়েরও বিয়ে দেবে। সামর্থ অনুযায়ী খরচও করবে। গীর্জাটি ছোট হলেও তার গুরুত্ব টমাসের কাছে কম নয়। তা রোশনাই জ্বালাতে, অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয়দের আপ্যায়নে কমপক্ষে সোয়া লক্ষ থেকে দেড় লক্ষের কাছাকাছি টাকা খরচ হবে। মারিয়ারও মনের আশা পূর্ণ হবে।

টমাস সুখের চিন্তায় বিভোর। মেয়ে, বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে আর আপনমনে হাসে। তার আর হ্যারিসের মনেও নতুন স্বপ্ন দোলা দিয়ে যায় বারবার।

এতসব কাণ্ডকারখানার মধ্যে বিষাদের ঝড় যেন অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে। বাবা-মেয়ে আসন্ন বিয়ের পরিকল্পনায় মত্ত। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করা শুরু হয়। নতুন রং ফেরানো হয় ঘরের ও বাইবের দেওয়ালের। কোথাও এতটুকু মালিন্য রাখা চলবে না। একটামাত্র মেয়ে, টমাস অভাব কিছু রাখবে না কোনমতেই। সব কাজ সারতে সারতে বিয়ের দিনটাও ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে। ওঃ কি যে দারুণ ব্যাপার হবে ভাবতে ভাবতে বুকে কাঁপন ধরে ওদেব। কিন্তু এত পরিশ্রম ও চিন্তা টমাসের শরীর এত বয়সে আর নিতে পারে না। টমাস একদিন বাড়িতে ফিরল প্রবল জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে। কোনরকমে বাবাকে বিছানায় শুইয়ে মার্থা ছুটল হ্যারিসের খোঁজে। এই বিপদে সে ছাড়া আর কেই বা আছে। হ্যারিস সব কথা শুনে ভালো ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তারবাবু বললেন 'মনে হচ্ছে জ্বরটা একটু ভোগাবে। কাল সকালেই রক্ত, পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করাতে হবে। তার রিপোর্ট দেখে চিকিৎসা শুরু করা যাবে। আজকের রাতে যাতে জ্বর না বাড়ে সেইজন্য ওষুধ দিয়ে গেলাম। জ্বর বেশী হলে মাথা ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে হবে। কপালে জলপটি লাগাতে হবে। হাতপাখার বাতাস অল্প অল্প করে করতে হবে। রাত্তিরে দুধ সাবু, কোনো ভয় নেই।' সব কিছু নিয়ম মানা সত্ত্বেও রোগ বাগ মানে না, বেড়েই চলে। মার্থা আর হ্যারিস সমানেই সেবা করে চলে। কদিন একটানা রাত জেগে দুজনেই ক্লান্ত, অবসন্ন। সেদিন বাতে একটা অজানা ভয়ে মার্থার কেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে। হ্যারিসকে বলে আজ রাতটা একটু কষ্ট করে থেকে যাওনা। কিন্তু পরের দিন সকালেই হ্যারিসকে পাটনা যেতে হবে। রেলের গার্ড হিসাবে কালকেই পাটনা অফিস থেকে ধানবাদ ট্রেনিং-এব জন্য চিঠি আনতে হবে, সকালে সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দেওয়ার পর। এখানে রাত্রে থাকতে গেলে সকালে পাটনা পৌঁছতে পারবে না সময়মত। মার্থাকে অনেক বুঝিয়ে বাড়ির পথে বওনা দেয় হ্যারিস। কদিন বাদেই বিয়ে। এখন এত কষ্টের চাকরি হারালে চলবে না।

বাবার মাথার কাছে বসে থাকতে থাকতে মার্থার চোখ ঘুমে জুড়ে আসে। এতদিনের ক্লান্তি থেকে কর্ত্তব্য ভুলিয়ে অবশ করে দেয়। হাতের পাখা কখন খসে পড়ে যায় সে জানতেও পারে না।

রাত গভীর। দরজা খুলে মারিয়া আসে টমাসের বিছানাব কাছে। তার কোমল স্পর্শে টমাস চোখ মেলে চায়। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মারিয়ার দিকে—এতদিন বাদে তোমার টমাসকে মনে পড়ল। আজ তাই কষ্ট করে এসেছো আমার কাছে। এত অভিমান

তোমার। কত সুখ-স্মৃতি ভিড় করে আছে আমার স্বপনে-শয়নে, তার কিছুই কি তোমায় কাঁদায় না। মারিয়া, এলেই যখন কষ্ট করে, তবে চলে যেও না। একটু আমার কাছে থাকো, সঙ্গ দাও, কাছে ব'স। তোমাকে ছাড়া আমার অসুখ আর সারবে না। আর আমাকে দুঃখ দিও না। মারিয়া চুপ করে থাকে। তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। মারিয়াকে কাছে পেয়ে অনেকটা শান্ত হয় টমাস। গভীর ঘুম আচ্ছন্ন ক'রে তাকে নিয়ে যায় আরোগ্যের কুসুমাস্তীর্ণ পথে।

ভোর হয়। মার্থার দেখা পায় না টমাস ওরফে টম্। কোথায় গেল মার্থা, মারিয়াই বা কোথায় গেল? ধীর, শান্ত, আস্তে আস্তে টম খাট থেকে নেমে আসে। আজ শরীরটা অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে। অনেকদিন যেন সে শুয়ে আছে। হঠাৎ মনে পড়ে, আজ রবিবার, গীর্জায় যেতে হবে। আর হাতে সময় নেই, কদিন বাদেই বিয়ে অথচ সে শুয়ে ছিল নিশ্চিন্ত মনে। মার্থাটাও এই সময় কাছে নেই। কোথায় গেল সাত সকালে? আজকালকার মেয়েদের মতি গতি বুঝতে পারাই দায়। এই আছে, এই নেই।

হঠাৎ যেন বজ্রপাতে তার সম্বিত ফিরে এল। মারিয়া কোথায়? সে তো নেই। বহুদিন আগেই সে তো পরম সুখে, সকল রোগ যন্ত্রণার উর্দ্ধে মাটির আরাম কেদারায় অপেক্ষা করছে তার জন্য। তাহলে, তাহলে কে এল কাল রাতে তার ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের যন্ত্রণা লাঘব করতে? কে? কে? কে?

আর ভাবতে পারল না, মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল গীর্জায়। আছড়ে পড়ল মাতা মেরী ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মূর্ত্তির পায়ের তলায়। একি সর্ব্বনাশ সে করেছে, কি করবে, কোথায় যাবে, কার কাছেই বা এ পোড়ামুখ দেখাবে। কার কাছেই বা মার্জ্জনা চাইবে। মাদার মেরী ও প্রভু জেশাস ক্রাইষ্ট ছাড়া অন্য কারুর কাছে সে মনের দুঃখ, যন্ত্রণা, পাপের কথা বলতে পারবে না। একমাত্র তাঁরাই পারেন এই অবস্থায় টমকে সঠিক পথের নিশানা দিতে। মারিয়া — এ আমার কি সর্বনাশ করলে। আজ এতদিন বাদে আমার মতিভ্রম ঘটালে? তার কান্না আর হাহাকার বাঁধ মানে না। সময় এগিয়ে চলে তার নিজস্ব নিয়মে। আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে আসে গীর্জার বেঞ্চগুলো। স্নেহমাখানো হাতের স্পর্শে তার চমক ভাঙে — ফাদার !

কি হয়েছে বাছা তোমার ?এত বাঁধভাঙা বন্যা কেন তোমার চোখে? ওঠ, শান্ত হও। কি হয়েছে? এত ভেঙে পড়লে চলবে না। টম সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। ফাদার আমি যে ক্ষমাহীন অপরাধ করে রোগমুক্তি

পেয়েছি। আমার মৃত্যুই শ্রেয়, আমি মরতে চাই, শান্তি পেতে চাই। শেষ হয়ে যেতে চাই। আমি বাবা সেজেছি, কিন্তু প্রকৃত বাবা হতে পারিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একি সীমাহীন অপরাধ করে ফেললাম ফাদার। মা মেরী তোমার পায়ের ধুলো পাবার অধিকারও হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে নরকের ভয়াল অন্ধকারে নিক্ষেপ কর, যেন পৃথিবীতে আমার মত জঘন্য অপরাধী না জন্মায়। ফাদার শান্তভাবে তার হাত ধরে স্বীকারোক্তির কাঠগড়ায় (Confession Box) নিয়ে যান। বলেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে মাতা মেরী ও প্রভু জেসাস্ ক্রাইস্টের কাছে নিঃসংকোচে তোমার অপরাধ ব্যক্ত কর। তাঁরা অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করবেন। তুমি ধৈর্য্য ধর, বিশ্বাস রাখো। তোমার অপরাধ তাঁরা মার্জনা করবেন। তুমি মনে শান্তি পাবে। এই বলে ফাদার চলে যান অন্তরালে।

অনেক কান্না, অনেক বুকভাঙ্গা হাহাকারের পর তার মন শান্ত হয়। ওখান থেকে সে নেমে আসে। চোখ পড়ে দরজার দিকে, দেখে তার মেয়ে মার্থা। দুর্বল, শ্রান্ত, অবসন্ন, ফ্যাকাসে মুখ, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে কোন মতে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার পিতার অপেক্ষায়, একসঙ্গে ঘরে ফিরে যাবে। আজই সে জেনেছে - হাহাকারের ভেতর দিয়ে সে পালিত কন্যা। তার পায়ের মাটি সরে গেছে। কেন এমন হ'ল ? তবে হ্যারিসও কি তাকে ফেলে চলে যাবে ? মাতা মেরীর মুখের দিকে চেয়ে সে শান্তির সন্ধান করে। এ জীবনে শান্তি সে কি আর কোনদিন পাবে ?.........

এক্সিকিউটিভ

সুপ্রতিম এম.বি.এ. পাশ করে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানীর মাঝারি এক্সিকিউটিভ। তবে তার কথাবার্তা চালচলন দেখলে মনে হয় ওই বোধহয় ওর কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। যদিও মধ্যবিত্ত পরিবারে ওর জন্ম কিন্তু অত্যধিক মেধার কারণে সে এই অল্প বয়সেই এত উচ্চপদে আসীন।

ওর স্ত্রী সুপ্রিয়া আর তিন বছরের ছোট্ট ছেলে সুপ্রতীককে নিয়ে কোলকাতার সল্টলেক অঞ্চলে একটা বহুতল বাড়ির চারতলার একটা ফ্ল্যাটে থাকে। ফ্ল্যাটটা বেশ বড়। সেই ফ্ল্যাটের তলায় গাড়ি রাখার গ্যারেজও আছে। সুপ্রতিমের ফ্ল্যাটের ভাড়া ওর কোম্পানীই বহন করে। এমনকি তার মোবাইলের বিল, গাড়ির তেল খরচ সবই কোম্পানী দেয়।

সুপ্রতিম রবিবার বাদে রোজ সকাল আটটায় বাড়ি থেকে অফিসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে, কিন্তু তার বাড়ি ফেরার কোন ঠিক নেই। রাত দশটা থেকে যে কোন সময়। পার্টি থাকলে রাত একটাও বেজে যায়। তখন কোম্পানীর গাড়ি তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়, কারণ মদ খেয়ে বেঁহুশ অবস্থায় সুপ্রতিম গাড়ি চালায় না। পার্টি থাকলে আগেই কোম্পানীর গাড়িকে ব্যবস্থা করে রাখে।

সুপ্রিয়ার সারাদিন একা একা সময় আর কাটতে চায় না। ও ভাবে ওর স্বামী যদি সাধারণ একটা সরকারি অফিসে কাজ করত, তাহলে রোজ রোজ সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে-ছ'টার মধ্যে স্বামীকে কাছে পেত। নানা গল্পগুজব করতে পারত, স্বামী, ছেলেকে নিয়ে কোন শপিং মলে দোকান বাজার করতে যেতে পারত, অথবা মাঝে মধ্যে ভাল সিনেমা থিয়েটারও দেখতে যেতে পারত। কিন্তু এখন এই চার দেওয়ালের বদ্ধ খাঁচার মধ্যে ক্রমশঃ ও হাঁফিয়ে উঠছে। কত ছেলের সঙ্গে আর টিভির সঙ্গে কাটানো যায়। ও ক্রমশঃ অনিদ্রা ও হতাশার শিকার হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এখান থেকে পালিয়ে না গেলে বাঁচবে না। বাবা, মার সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নি। শুধু ফোনে যোগাযোগ। মা, বাবা বর্ধমানে থাকেন। ওঁদের পক্ষে তাঁদের নিজস্ব কাজকর্ম ফেলে এতদূরে সল্টলেকে মেয়ের বাড়ি আসা সম্ভব হয় না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সুপ্রিয়া একাকিত্ব কাটাতে ঘরের বাইরের খোলা বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। ছেলে সুপ্রতীক পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। আকাশটা বর্ষার কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হয়ত দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। এই অলস

দুপুরে বাইরের খোলা হাওয়ায় বসে সুপ্রিয়ার মনটা ফিরে গেল ছোটবেলার নানা টুকরো ঘটনায়, সদ্য বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা কাটানোর জন্য পুরীতে সুমদ্রের উদ্দাম ঢেউয়ের তালে তালে সুপ্রতিমের সঙ্গে লাফালাফি, হৈ-হুল্লোড়, উচ্ছল আনন্দ।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে বিয়ের সময়। সুপ্রতিম তখন সদ্য এম.বি.এ. পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছে। এখনকার মত এত দায়িত্ব ছিল না। ওর মনটা খুব খোলামেলা, পরিষ্কার ছিল। তখন বিবাহিত জীবনের স্বাদ অন্যরকম ছিল। হঠাৎ হঠাৎ দুপুরে বাড়ি চলে আসত — এসেই বলত কি খাবার আছে তাড়াতাড়ি দাও, খুব খিদে পেয়েছে।

— তুমি অফিস থেকে এই সময় চলে এলে ?

— এদিকে একটা ফ্যাক্টরীতে ইন্সপেক্শনে এসেছিলাম। ফেরার সময় ভাবলাম তুমি কি করছ দেখে যাই। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল-চলে এলাম। বিকেলে অফিস যাব।

— রাত্রিতে ফিরেই তো আমাকে দেখতে পেতে। তোমার একটুও সংযম নেই। সব সময় অসভ্যতা। সবে চাকরীতে ঢুকেছো। এখন থেকেই ফাঁকিবাজি।

— ও সব বাজে কথা ছাড়ো বলে হাত ধরে টানতে টানতে শোওয়ার ঘরের খাটে এনে ফেলল। কোন ওজর আপত্তি শুনলো না। শুনতে চাইলও না। সেভাবে তাকে বাধাও দেওয়া গেল না।

এই পাঁচ বছরে কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। বিবাহ বার্ষিকীর দিনেও ফিরতে রাত্রি এগারোটা। পুরো মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। তখন বিবাহ বার্ষিকীর দিনটাকে সুপ্রিয়ার ঘৃণা হয়। মনে হয়, বিয়েটা ওর সঙ্গে না হলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু মানুষটা তো এমন ছিল না! হঠাৎ হঠাৎ অফিস পালিয়ে চলে এসে সিনেমা দেখাতে অথবা হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে যেতো। আমি যদি অনুযোগ করতাম, আমার বিবেকে লাগছে তুমি এরকম অফিস পালিয়ে বেড়াচ্ছো ?

— বলত, ও সব বিবেক ফিবেক ছাড়। অফিস পালিয়ে ঘুরতে বেরোনোর মজাটাই অলাদা। ছেলে হওয়ার পরও এরকম মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেতো। কিন্তু এখন বছর খানেক হ'লো এমন অদ্ভুত পরিবর্তন ওর মধ্যে এসেছে।

— মদ খাও কেন ? শরীর খারাপ করবে। সুপ্রিয়া, সুপ্রতিমকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, ও বলত —

— এক্সিকিউটিভদের পার্টিতে গেলে একটু আধটু খেতে হয়। এটা আমাদের কাজের

একটা অঙ্গ। তুমি কিছু মনে কোর না। আমি সামান্য দু-এক পেগ খাই, বেশী খাই না।
— তুমি তো বিয়ের পরও সিগারেট খেতে না। এখন তো সেই নেশাটাও ধরেছো। টি.ভি.-তে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, ওসব নেশা করলে শরীরের ক্ষতি। তুমি ভালোভাবে বাঁচলে আমাদের সংসারটাও বাঁচবে। সুপ্রতীককে বড় করতে হবে। ভালোভাবে মানুষ করতে হবে। বিরাট দায়িত্ব আমাদের। তুমি অবুঝ হোয়ো না। একটু বোঝার চেষ্টা কর।
— আমাদের চাকরীতে একটা লক্ষ্য মাত্রা বা টার্গেট পূরণ করার চাপ থাকে, তার ওপর চাকরীতে উন্নতির প্রশ্ন থাকে। চাকরীতে টার্গেট পূরণ করাতে না পারলে চাকরীর নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। তবে তোমাকে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি — কোনরকম ভাবেই তোমার ও ছেলের অসুবিধা ঘটাবো না।
— এই কথাটা মনে থাকে যেন।
— হ্যাঁরে বাবা, মনে থাকবে, থাকবে, থাকবে। এই তিন সত্যি করলাম।

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সুপ্রতিমের মত ভাল ছেলে হয় না। কিন্তু রাত্রে মদ পেটে পড়লে দ্রব্যগুণের ফলে ডা: জেকিল এণ্ড মি. হাইড।

সুপ্রতিম মাঝে মাঝে কোনও রবিবার সুপ্রিয়া ও ছেলেকে নিয়ে ফ্যামিলী পার্টিতে যায়। সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করে রাত্রে ক্লান্ত শরীরে বাড়ী ফেরা। কিন্তু পার্টিতে সুপ্রিয়া হালকা পানীয় গ্রহণ করে বলে — সুপ্রতিম অভিযোগ করে — অফিসের সব এক্সিকিউটিভের মিসেস্‌রা রাম্, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর তুমি একটা গাঁইয়া ভূত-শুধু অরেঞ্জ স্কোয়াস্, ম্যাঙ্গো জুস্, কোকো-কোলা খাচ্ছ। এতে আমার প্রেস্টিজ থাকছে না।

সুপ্রিয়া বলে — তুমি ঐসব ছাইপাঁশ খেলেও আমি জীবনে ওসব ছোঁব না, তাতে তোমার প্রেস্টিজ গেলো কি থাকলো তা আমার জানার দরকার নেই। এই রকম ছোটখাটো দু-একটা কথা কাটাকাটি প্রায়ই সুপ্রতিমের সঙ্গে সুপ্রিয়ার হয়, আবার মিটেও যায়। একদিন সেটা চরম আকার ধারণ করে।

— রাত্রে এগারোটা নাগাদ সুপ্রতিম কোম্পানীর গাড়িতে মাতাল অবস্থায় বাড়ি এলো। ভালো করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। অফিসের ড্রাইভার ওকে হাত ধরে এনে ঘরের সোফায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। সুপ্রিয়া ওর ছেলেকে দশটার মধ্যে খাইয়ে পাশের ঘরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। সুপ্রতিম বাড়ী আসার পর বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুপ্রিয়া ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বার করল। সুপ্রতিমের মুখে, ঘাড়ে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে

তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। খানিক বাদে সুপ্রতিম একটু ধাতস্থ হয়ে একটা সিগারেট ধরালো। সুপ্রিয়া দৌড়ে এসে সুপ্রতিমকে বলল — তুমি এই এ.সি. ঘরের মধ্যে সিগারেট খেয়ো না। দরকার হলে বাইরের বারান্দায় বসে খাও। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমাদের বাচ্চাটার ক্ষতি হবে। বদ্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়াটা ছেলের নাকে গেলে ওর খুব ক্ষতি হবে। তুমি বাবা হয়ে ওর এই ক্ষতি কোরনা, লক্ষীটি, তোমার পায়ে পড়ি।

— আমার বাড়িতে আমি সিগারেট খাব, বেশ ক'রব। যখন খুশি খাব, যা ইচ্ছে হবে তাই করবো। আমার পার্টির মেজাজটা নষ্ট কোরনা।

— তুমি এত অবুঝ হচ্ছ কেন ? একটু বোঝার চেষ্টা কর। ছেলেটা তো তোমার, আমার, দু'জনের। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, এমন কোর না।

— দূর শালা, হারামজাদি মাগী, এখানে এসে আমার পয়সায় এ.সি. বাড়িতে থাকছিস, এ.সি. গাড়ি চাপছিস্ আর আমার মুখের ওপর কথা।

এই কথা বলেই সুপ্রিয়াকে সজোরে জুতো পরা পায়ে একটা লাথি কষালো।

— বেবো, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ঐ জন্যে বাড়ি আসতে ইচ্ছে করে না। যত্ত সব প্যান্‌প্যানানি।

সুপ্রিয়ার আজ খুব সন্ধ্যা থেকেই খিদে পেয়েছিল। ভেবেছিল সুপ্রতিম বাড়ি ফিরলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে জর্জরিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে ছেলের পাশে শুয়ে পড়ল। ঘুম কিছুতেই আসছে না। যতসব উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ছোটবেলায় বাবা, মার স্নেহ-যত্নে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। মেয়ে দুঃখ পাবে বলে ওর বাবা মা কোনদিন জোরে বকুনি পর্যন্ত দেননি। আর আজ কিন এত বয়সে মাতাল এক্সিকিউটিভ স্বামীর গালাগাল আর লাথি জুটল কপালে। রাত্রে খাওয়াটাও হ'ল না। ভাগ্যিস, ছেলেটাকে আগে খাইয়ে দিয়েছিল।

পরের দিন সকালে আবাসনের পার্কের মাঠে ভিড় জমে গেছে। একটি মাঝ বয়সী মহিলা ও একটি বাচ্চা ছেলের লাশ পড়ে আছে। পার্কের সিমেন্টের বসার জায়গায় খানিকটা কালো জমাট বাঁধা রক্ত লেগে রয়েছে। তার তলাতেই মহিলার লাশটা পড়ে আছে। সিমেন্টের বেঞ্চিতে ভদ্রমহিলার মুখটা থেঁতলে গেছে। চেনা যাচ্ছে না। বাচ্চা ছেলেটা ঘাসের উপর পড়ে আছে। মুখটা অক্ষত কিন্তু ফুলে উঠেছে। পার্কের পাশের ফ্ল্যাটের অধীরবাবু বললেন — এতো আমাদের ফ্ল্যাটের সুপ্রতীমবাবুর স্ত্রী ও তাঁদের বাচ্চা। চারতলার

খোলা বারান্দা দিয়ে ভোররাত্রে ঝাঁপ দিয়েছে। ঘুমের ঘোরে একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম বটে কিন্তু ভাবতে পারিনি এত বড় বিপদ ঘটে গেছে।

সুপ্রতিমবাবুর ফ্ল্যাটের বাইরের দরজার ডোরবেলটা বেজে উঠল। কারুর সাড়া নেই। তারপর জোরে জোরে দরজায় ধাক্কার আওয়াজ সুপ্রতিমের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে দরজা খুলেই ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠল — এত সকালে হঠাৎ আপনারা ?

— এখন সকাল কি বলছেন মশাই ! বেলা ন'টা বাজে। আমি সল্টলেক থানার ও.সি। আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

— আমি তো মশাই রাত্তিরে একটু-আধটু মাল খাই। তা, ও.সি. সাহেব-আপনি তো আমার গুরু। দিনের বেলাতেই চাপিয়েছেন। তা হয়েছেটা কি ? আমাকে বিরক্ত না করে নিজের কাজে যান। সুপ্রতিম চেঁচিয়ে বলল — সুপ্রিয়া, আমার অফিসের দেরী হয়ে গেছে। ও.সি. সাহেবকে তাড়াতাড়ি বিদায়ের ব্যবস্থা করো।

— সে ব্যবস্থা সুপ্রিয়া দেবীকে আর করতে হবে না।

— কেন ?

— আমার সঙ্গে আপনার ঘরেব বাইরের খোলা বারান্দায় আসুন বলে ও.সি. সুপ্রতিমের হাত ধরে টানতে টানতে বারান্দায় নিয়ে এসে বললেন — নীচের দিকে চেয়ে দেখুন। তারপর একজন কনস্টেবলকে বললেন — ফ্ল্যাট্‌টা সীল্‌ করে দিন।

পুলিশ ভ্যানে ওঠার আগে সুপ্রতিম একবার সেই জমে থাকা ভীড়ের মধ্যে দিয়ে এক নজর তাকিয়েই, মুখটা উল্টোদিকে ফিরিয়ে নিল..........তারপর মুখ নীচু করে, মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে গেল............।

পীরের মেলা-ডাকাতের খেলা

স্বপনবাবু রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অবসরগ্রহণের আর বছর দুয়েক বাকি। এখন ষাট বছর বয়স হলেই অবসরগ্রহণ করতে হবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অবসরগ্রহণের সময়সীমা ছিল পঁয়ষট্টি বছর। তবে মাহিনা অনেকটাই বেড়েছে। মাস্টারমশাইদের এখন একটু স্বচ্ছল অবস্থা। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের মাসমাহিনা একষ পঁয়ষট্টি + মাগ্গীভাতা (তিন মাস অন্তর) আর নেই। তার সঙ্গে পরিচালন সমিতির মর্জিমাফিক চাকরীতে বহাল না থাকা নির্ভর করত।

স্বপনবাবু নিঃসন্তান। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কোন সদস্য নেই। গতকাল স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে দেখেন দুমকা থেকে তাঁর ছোট শ্যালিকা তার একমাত্র পুত্র সায়ন্তনকে নিয়ে হাজির। রাণীগঞ্জের বিখ্যাত পীরবাবার মেলা দেখতে এসেছে। আট-দশ দিন থাকবে। আগামীকাল বিকালে পীরবাবার মেলার উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন ঐ এলাকার মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কেশব চৌধুরী।

স্বপনবাবুরা নিঃসন্তান বলে তাঁদের খুব আনন্দ হয়েছে সায়ন্তনকে নিয়ে ওর মা এসেছেন বলে। বাড়িতে খুব ভালভাল রান্না হচ্ছে। চারিদিকে হৈ-চৈ আনন্দ। তবে ছেলেটার একটাই অসুবিধা। হিন্দীভাষী অঞ্চলে থাকার কারণে বাঙলা ভাষা লিখতে ও পড়তে জানেনা। কথাবার্তাতেও বাংলার চেয়ে হিন্দীতেই স্বচ্ছন্দবোধ করে। সায়ন্তন দুমকা হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে।

পরের দিন বিকালে স্বপনবাবু সায়ন্তনকে নিয়ে পীরবাবার মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে গেলেন। চারিদিকে আলোর রোশনাই। মাইকের আওয়াজ, পটকা ফাটার আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

ঐ মেলায় প্রচুর দোকান বসেছে। পীরবাবার মাজারে চাদর চড়াবার জন্য চাদরের দোকান প্রায় আট-দশটা। তাছাড়া নামাজ পড়ার জন্য টুপি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, শাড়ী ও রঙীন চুড়ির দোকানও আছে। বাড়িতে সংসার চালানোর টুকিটাকি জিনিস যেমন- কাঁচ, লোহা, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি, হাতা, বঁটি ইত্যাদি। সর্বোপরি আছে হরেক রকমের খাবারের দোকান-সেখানে পরোটা, মাংস, রুটি, কাবাব, বিরিয়ানী এমনকি কচুরী, সিঙ্গাড়া, জিলিপির দোকানও আছে।

বেশ কিছুক্ষণ মেলায় ঘোরাঘুরির পর স্বপনবাবু লক্ষ্য করলেন-সায়ন্তনের মুখটা

খিদেতে শুকিয়ে গেছে। মেলা দেখার আনন্দে খিদের কথা ভুলে গেছে। উনি তাড়াতাড়ি সায়ন্তনকে নিয়ে একটা ময়রার দোকানে ঢুকলেন। সেখানে ঢুকে সায়ন্তনকে জিজ্ঞেস করতে যাবেন ও কি খেতে চায় এমন সময় পাশে তাকে দেখতে পেলেন না। দোকান থেকে বেরিয়ে আশে পাশে একটু ঘুরে দেখে হতাশ হয়ে দোকানে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে পড়ে পাশের জালা থেকে একমগ জল তুলে নিয়ে ঢকঢক করে পান করে দু'হাতে মাথা-কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

দোকানের অন্যান্য খরিদ্দার স্বপনবাবুর এহেন অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন-কেন তিনি এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। স্বপনবাবু তাদের সব ঘটনা খুলে বললেন। এক ভদ্রলোক বললেন — আপনার শালীর ছেলেক আর খুঁজে পাবেন না মশাই। ইউসুফ মিঞার দল তাকে এতক্ষণে পাচার করে দিয়েছে।

— ইউসুফ মিঞা কে ভাই? তার নাম তো কোনদিন শুনিনি। আমি তো এখানকার হাইস্কুলের হেড মাষ্টারমশাই।

— ওসব ক্রিমিনালদের খবর তো আপনাদের কাছে থাকার কথা নয় মাষ্টারমশাই। আপনি তো মানুষ গড়ার কারিগর। ওসব অমানুষদের খবর আপনাদের কাছে কি করে থাকবে!

পাশের একজন খরিদ্দার বললেন - ইউসুফ মিঞা বছর দশেক আগে ছিঁচকে চুরি করত। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে কিছুদিন জেল খেটেছিল। সেখানে বড় নামকরা দাগী আসামীদের সঙ্গে মিশে জেল থেকে বেরিয়ে এসে ট্রেনে, মাড়োয়াড়ী গদিতে ডাকাতি করা শুরু করল। নিজেই ডাকাত সর্দার বনে গেল। ডাকাতি তো এখন ব্যবসা! ডেলি রোজে কিছু ছেলেকে জুটিয়ে চুটিয়ে ডাকাতি করতো। সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দেওয়ায় পোড়ো খাদান থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা তুলে পাচার, রেল ওয়াগন ভাঙা-সব কাজেই হাত পাকালো-প্রচুর পয়সাও করেছে। এখন লাইন পাল্টেছে — কয়লা মাফিয়া থেকে ড্রাগ মাফিয়ার রূপান্তর ঘটেছে। ওর লোকজনেরা ওপাশে সীতারামপুর থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত হেরোইন বিক্রি করে তার টাকা ওকে জমা দেয়। ও তার পরিবর্তে তাদের কমিশন দেয়। যত টাকার ড্রাগ বিক্রি করবে তার দশ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন হিসাবে পাবে। অন্যান্য অঞ্চলের ড্রাগ মাফিয়ারা পাঁচ শতাংশ কমিশন দিত বলে তাদের কাছ থেকে ছেড়ে চলে এসে ইউসুফ মিঞার দলে ভিড়েছে। তার জন্য সব ঝক্কি-ঝামেলা ইউসুফ মিঞাই বহন করে। জায়গা মত ঘুষ দেওয়া, বড় বড় অফিসারদের ভেট দেওয়া, আবার অন্য অঞ্চলের কোন মাস্তান মাথা চাড়া দিলে তাকে খুন করে কালীপাহাড়ী রেল লাইনে ফেলে দেওয়া সব

কাজই দায়িত্ব নিয়ে করে। সেইজন্য ওর খুব নামডাক! ইদানীং পুলিশের ধরপাকড় একটু বেড়েছে বলে দূরের গ্রাম থেকে মেয়েদের ধরে এনে দেহব্যবসায় নামানো আর ছোট ছেলেদের ধরে এনে কিডনী কেটে বিক্রি করা এখন ব্যবসা। তার জন্য বড় বড় হাসপাতালের সঙ্গেও ওর যোগাযোগ আছে।

— ও মশাই, আপনার শালীর ছেলেকে নির্ঘাৎ কিডনী পাচারের জন্য চুরি করে নিয়ে গেছে।

স্বপনবাবু বললেন — আমি তো ইউসুফ মিঞার নাম পর্যন্ত কোনদিন শুনিনি, আর আপনি তো তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন দেখছি। তা আমাদের ছেলেটাকে যাতে সুস্থ অবস্থায় ফেরৎ পাই তার কিছু হদিশ দিতে পারবেন কি?

— না মশাই, তা পারব না। আমি কি বেঘোরে মরব নাকি?

— তাহলে ইউসুফ মিঞার গল্প ফেঁদে আমার শুধু শুধু সময় নষ্ট করলেন। আচ্ছা লোক মশাই আপনি। আমার ছাত্র হলে সপাং সপাং করে দশ ঘা তার পিঠে বেতের বাড়ি মারতাম। বাজে গল্প করে সময় নষ্ট করার ফল বুঝিয়ে দিতাম।

এই কথা বলে রাগে, হতাশায় গজগজ করতে করতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আবার মেলায় 'সায়ন্তন, সায়ন্তন' বলে চেঁচিয়ে তাকে খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় বেশ লম্বা-চওড়া সুপুরুষ এক যুবক তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন — কি হয়েছে স্যার? এমন উদ্‌ভ্রান্তের মত কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

— তোমাকে তো বাবা চিনতে পারছি না। অবশ্য মুখটা আবছা চেনা চেনা লাগছে।

— আমি কুশল। কুশল চক্রবর্তী — এইট্টি ফাইভের ব্যাচ।

— হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার সঙ্গে হিমাদ্রী, প্রদীপ এরা পড়তো তো?

— হ্যাঁ স্যার।

— তা বাবা, তুমি এখন কি কর?

— আমি স্যার, পাশের জামুড়িয়া থানার ও.সি. কিছুদিন হলো উত্তরবঙ্গ থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছি। তা আপনার হয়েছেটা কি?

স্বপনবাবু তাঁর ছাত্রকে সব ঘটনা খুলে বললেন।

কুশলবাবু তাঁর মাষ্টারমশাইকে বললেন — আসুন স্যার আমার সঙ্গে, যদি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

কুশলবাবু রাণীগঞ্জের সি.আই. (Circle Inspector) মিঃ দাশগুপ্তর কাছে

এসে সব ঘটনা বললেন। তিনি মাস্টারমশাইকে বললেন - আমি স্যার আপনাকে দু'জন অভিজ্ঞ আই.বি. ইন্সপেক্টর সঙ্গে দিচ্ছি। তারা আপনার সায়ন্তনকে খুঁজে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। অবশ্য এতক্ষণে যদি দূরে পাচার না হয়ে যায়। এই কথা বলে বেল টিপে আর্দালীকে ডেকে দু'জন আই.বি. ইন্সপেক্টরকে ডেকে আনতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা এলে সি.আই. সাহেব তাঁদের কি করতে হবে সেটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

সি.আই. সাহেবের অফিস থেকে যখন ওঁরা বেরোলেন তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। দুটো রিক্সা নিয়ে মাইল তিনেক দূরে তারা ই.সি.এল.-এর একটা নির্জন পরিত্যক্ত কয়লাখনির খাদানের কাছে পৌঁছলেন। একটু দূরে একটা খোলা মাঠ মত জমিতে তিন-চারটে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের স্কুল যাওয়ার গাড়ির মত ভ্যান্ রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। আই.বি. ইন্সপেক্টরের টর্চ জ্বালিয়ে দেখলেন-ঐ ভ্যান রিক্সাগুলোর মধ্যে ছোট ছোট ছেলেবা বসে আছে। ভ্যান রিক্সাগুলোর গেটে বাইরে থেকে তালা লাগানো। মাঠটা শুয়োরে খুঁড়ে খুঁড়ে চলাফেরার অযোগ্য। তারমধ্যে পূতিগন্ধময় নোংরা জল জমে আছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়েও দম্ আটকে আসছে। দূরে দূরে দু-একটা বিড়ির আগুন ধুক্‌ধুক্ করে জ্বলছে, নিভছে। দূর থেকে ওরা মাস্টারমশাইদের উপস্থিতি লক্ষ্য করছে। কুশলবাবুর অভিজ্ঞ চোখে সেটা এড়ালো না। তিনি বজ্রহুঙ্কারে ডাকলেন — ইউসুফ, আমরা তোমাব কাছে এসেছি। সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি এস। আমাদের বাধ্য কোরনা গুলি চালাতে কারণ পুরো এরিয়াটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। একটা রোগা বেঁটে মত, লুঙ্গি পরা লোক এসে কুশলদের বললেন — কি ব্যাপার, এত চেঁচাচ্ছেন কেন? কাকে চাই?

— তোর বাপ্‌কে রে হতভাগা, শুয়োরের বাচ্চা — আমাদের দু'জনকে তুই চিনিস্ না, ন্যাকা। আবার যখন তুলে নিয়ে গিয়ে পা দুটো ওপর দিকে ঝুলিয়ে পেছনে রুলের গুঁতো দেব, তখন চিন্‌তে পারবি। আমাদের সময় নেই, তাড়াতাড়ি ইউসুফকে ডাক। আমাদের মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির ছেলেকে আজ বিকেলে পীরবাবার মেলা থেকে তুলে এনেছিস। ভালয় ভালয় ফেরৎ দে, তা না হলে তোদের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেব।

লোকটা কোন কথা না বলে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দু'-তিনজন লুঙ্গি, স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা ষণ্ডা মার্কা গুণ্ডা গোছের লোক ঐ ভ্যানরিক্সাগুলোর একটার চাবি খুলে একটা ছোট ছেলেকে নামিয়ে ওদের কাছে নিয়ে এলো। সবথেকে ভাল চেহারার লোকটা হাতে খৈনী ডল্‌তে ডল্‌তে আই.বি. ইন্সপেক্টরদের উদ্দেশে বলল — আপনারা এখানে কষ্ট করে কেন এলেন? থানায় তলব করলেই আমার লোক যেত।

— অনেক হয়েছে, দে, ছেলেটাকে দে

— কুশলবাবু মাষ্টারমশাইকে বললেন — এই আপনার সায়ন্তন তো ?

— হ্যাঁ বাবা, খুব উপকার করলে। সারাজীবন তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না। এই ছেলেকে আজ না পেলে বাড়ি ফিরতে পারতাম না। লজ্জায় এর মা-মাসীর কাছে মুখ দেখাতেও পারতাম না। মাষ্টারমশাই দু'হাত তুলে তাঁর ছাত্রকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

কুশলবাবুকে দেখিয়ে আই.বি.'র দু'জন ইন্সপেক্টর ইউসুফকে বললেন — ইনি জামুড়িয়া থানার ও.সি.। খুব কড়া লোক। মনে থাকে যেন। কাল থানায় যাবি। বড়বাবু ডেকেছে।

— মাস্টারমশাই অর্থাৎ স্বপনবাবু যখন সায়ন্তনকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তখন প্রায় রাত্রি আটটা। জানলায় তাঁর স্ত্রী ও শালী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁদের রিক্সা থেকে নামতে দেখে দু'জনে দরজা খুলে দৌড়ে এলেন — কি ব্যাপার এত দেরী, আমরা তো খুব চিন্তায় ছিলাম।

— চিন্তার কিছু নেই। আগে ছেলেটার হাত-মুখ ডেটল দিয়ে ধুইয়ে জামা-কাপড় পাল্টে দাও। তারপর এক কাপ গরম দুধ ও পেটভরা কিছু খাবার খাওয়াও। খুব ধকল গেছে বাচ্চাটার। পারলে আমাকেও এক কাপ চা দিও।

ক্যালেণ্ডার

সুনন্দ ও সিক্তার কিছুদিন হ'লো বিয়ে হয়েছে। সুনন্দ রাজারহাট উপনগরীতে পাঁচ তলায় দক্ষিণ-পূর্ব খোলা আটশো বর্গফুটের খুব সুন্দর ফ্ল্যাট কিনেছে। মার্বেল পাথর বসানো মেঝে। বেশ ফাঁকা চারদিক, ফলে আলো, হাওয়া প্রচুর। গ্রীষ্মকালে ঘরের জানলা দিয়ে রাতে পূর্ণিমার চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ওরা দুজনে গায়ে মেখে নেয়।

সুনন্দরা কলেজ স্ট্রীটে যে বাড়িতে ভাড়া থাক্‌ত সেখানে চাঁদের আলো দূরে থাক্ সূর্যের মুখও অতি কষ্টে দেখা যেত। সকাল-সন্ধ্যা বিজলী বাতিই ভরসা। নতুন ফ্ল্যাটে এসে ওরা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে, সূর্যের আলো ও চাঁদনী রাতের শোভা ওদের মন, প্রাণ ভরিয়ে দেয়।

সুনন্দ ও রক্তিম কোলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে একসঙ্গে পড়ত। দুজনের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়। কলেজের পরে সাত-আট বছর পার হয়ে গেলেও ওদের বন্ধুত্বের রঙ ফিকে হয়নি। গাঢ়ই আছে। যদিও তাদের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। একদিন রবিবার সকালে বাজার করতে গিয়ে সুনন্দ রক্তিমকে আবিষ্কার করে।

—— হ্যাঁরে রক্তিম, তুই এখানে ?

—— আমিও তাই ভাবছি। কতদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। এখানে তোকে ব্যাগ হাতে বাজার করতে দেখে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে।

—— তুই কি এখানে ফ্ল্যাট কিনেছিস ?

—— না, না। আমার শ্বশুরমশায় এখানে ফ্ল্যাট কিনেছেন। আমরা মাঝে মাঝে শনিবার আসি, রবিবার বিকালেই বাড়ি ফিরি। তুই তো জানিস্, রাখি বাবা মা'র একমাত্র সন্তান। তাই ওনাদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে একটু সময় কাটাই। ওনারা একটু বাঁচার জন্য অক্সিজেন পান, আমার মেয়ে তিন্নির সঙ্গ লাভ করে। জানিস তো, টাকার চেয়ে সুদের দাম বেশী। রাখির চেয়ে তিন্নির ওপর ওঁদেব টান খুব বেশী। তিন্নিও দাদু-দিদাকে অনেকদিন দেখতে না পেলে মন খারাপ করে বসে থাকে। অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে গল্প হ'ল। এখন চল্ আমার শ্বশুরবাড়ি, কাছেই। রাখিও তোকে দেখলে আনন্দ পাবে।

দুজনে বাজার করে রক্তিমের শ্বশুরবাড়ি গেল। দরজায় লাগানো কলিংবেল্‌টা রক্তিম বাজাতেই ওর ছোট্ট মেয়ে তিন্নি মার সঙ্গে এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। রক্তিম রাখিকে বলল——

— দেখ, কাকে ধরে এনেছি, চিনতে পারছ ?

— অনেকদিন দেখা হয়নি বলে সুনন্দদাকে চিন্‌তে পারব না এটা হয়না। অত কম মেমারী আমার নয়। আসুন, সুনন্দদা। বৌদি কোথায়, ওনাকে আনেন নি ?

— হঠাৎ বাজারে রক্তিমের সঙ্গে দেখা। ওই জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে এল।

তিন্নি খুশীতে উচ্ছল। ওর বাবার আঙুল হাত দিয়ে চেপে ধরে আনন্দে আব্দার করতে লাগল — বাবা, আমার জন্যে কি এনেছো, কি এনেছো বলে, লাফাতে লাফাতে বাবার সঙ্গে চললো। এই দেখে সুনন্দর মনটাও খুশীতে ভরে উঠল। সত্যি, বাড়িতে বাচ্চা না থাক্‌লে মানায় না। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। জীবনের পূর্ণতা আসে না।

চায়ের টেবিলের আড্ডায় রক্তিম সুনন্দকে বলে — আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তুইতো কলেজ স্ট্রীটে থাকতিস ?

— হ্যাঁ, কিছুদিন হ'লো ফ্ল্যাট কিনেছি।

— তোর ছেলেমেয়ে কি হ'ল।

— এই তো সবে দু'বছর হলো বিয়ে হয়েছে। তারপরে ব্যাঙ্ক থেকে হাউস বিল্ডিং লোন করে বাড়ি কিনেছি। এত তাড়াতাড়ি এসব চিন্তাই করতে পারছি না। সবুর কর - আরও কদিন আনন্দ ফূর্তি করে এখানে সেখানে বেড়াই। তারপর ওসব চিন্তা ভাবনা করা যাবে। আর বাচ্চা হলেই তার পড়ার স্কুল, আঁকার স্কুল, গানের স্কুল, সাঁতার শেখার ক্লাব এইসব করতে গিয়ে কোথাও বেরোনো হবে না। সেইজন্য আমরা ঠিক করেছি চার-পাঁচ বছর পরে ও নিয়ে চিন্তাভাবনা ক'রব। এখন কোনমতেই নয়।

রক্তিম বললো — এই প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে যেন। নতুন বিয়ের পর অনেকেই ঐসব গল্প বলে, পরে দেখা যায় বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাচ্চার বাপ্। ঐসব আওয়াজ অন্য লোককে দিস্।

এইসব হাসি ঠাট্টা মধ্যে তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হল। নতুন করে যোগাযোগ বাড়ল দুই পরিবারের মধ্যে। রক্তিম রাজারহাটে এলেই সুনন্দর ফ্যাটে আসে। সুনন্দও মাঝে মাঝে মধ্যমগ্রামে রক্তিমের বাড়িতে সিক্তাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। একদিন রক্তিম সুনন্দর ফ্ল্যাটে এসে ওদের বললো — হনিমুনের পরে তোমরা তো বেড়াতে যাওনি। অল্প খরচায় চলো কাছেই দার্জিলিং, গ্যাংটক বেড়িয়ে আসি। বেশীদিন ছুটিও নিতে হবে না।

রক্তিম ওদের ডাইনিং স্পেসের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডার দেখতে গেল টেবিলে গরম চা, সিঙাড়া ফেলে রেখে। দু-একটা ক্যাজুয়াল লিভ্ নিলেই টানা চার-পাঁচ দিন ছুটি

পাওয়া যাবে তার সন্ধানে ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল।

সুনন্দ বললো — তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। গরম চা, সিঙাড়া ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল আর তোর এতক্ষণে ক্যালেণ্ডার দেখা শেষ হ'ল না। আয় তাড়াতাড়ি, তোর জন্যে আমাদের চাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

রক্তিম হা, হা করে হাসতে হাসতে টেবিলে বসে সিক্তাকে বললো — ম্যাডাম, শুধু চা খাওয়ালে হবে না — কফির সঙ্গে চিকেন প্যাটিস্ খাওয়াও। এত বড় সুখবর আর তোমরা চেপে গ্যাছ।

সুনন্দ ও সিক্তা এ কথা শুনে চমকে উঠল। কি এমন গোপনীয় ব্যাপার যেটা রক্তিম জেনে ফেলেছে। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। রক্তিম আরও বললো — যেতে গেলে দু-এক মাসের মধ্যেই যেতে হবে। ক্যাজুয়াল লিভ্ না পেলে জমানো ছুটি ভাঙিয়েই যেতে হবে কারণ তারপর তো সিক্তা আর বেশ কিছুদিন বাইরে বেড়াতে যেতে পারবে না।

সুনন্দ ও সিক্তা বিস্ময়ে হতবাক্। দুজনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে বললো — দুমাস বাদে আমরা যেতে পারবো না কেন? সিক্তা বলে, কি ব্যাপার? আজকাল তুমিও জ্যোতিষী হয়ে গেলে নাকি? রোববারের কাগজে ফটো ছাপিয়ে তোমার বিজ্ঞাপন দিই — বিখ্যাত তান্ত্রিক যোগী পুরুষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতে ভবিষ্যৎ বিচার করেন — বিফলে মূল্য ফেরৎ — ফোন নং......মোবাইল নং......সুনন্দও রক্তিমকে বললো ছোট থেকেই তোব ঐ হেঁয়ালী করে কথা বলার ওভ্যেস। এত বয়সেও সেটার পরিবর্তন হ'ল না।

রক্তিম হাসতে হাসতে বললো — ম্যাডাম্, আমার আর দেরী সহ্য হচ্ছে না। এখুনি কফি খাওয়াও। চিকেন প্যাটিসের সঙ্গে ভাল খাওয়াটা ডিউ থাক্, পরে সুদে-মূলে আদায় ক'রব।

সিক্তা বলে — এখুনি তো চা খেলে, একটু গল্পগুজব করো। আড্ডাটা ভাল করে জমুক। একটু বাদে কফি খাওয়াচ্ছি।

— তহলে পরেই জেনো — কেন অতক্ষণ ধরে ক্যালেণ্ডার দেখছিলুম।

— আচ্ছা বাবা আচ্ছা, এখুনি কফি খাওয়াচ্ছি বলে সিক্তা রান্নাঘরে চলে গেলো।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে রক্তিম সুনন্দকে বললো — দার্জিলিং-গ্যাংটকের পুরো খরচ তোকে দিতে হবে — তোর প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্য।

— কি প্রতিজ্ঞা, কবে করেছি। কিচ্ছু মনে পড়ছে না। সিক্তাও এইসব কথা শুনে অবাক

হয়ে রক্তিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের এই অপ্রস্তুত অবস্থা দেখে রক্তিম হাসতে হাসতে সিক্তাকে বললো — ম্যাডাম, তোমার ভুলের জন্যই সুনন্দকে খেসারত দিতে হচ্ছে।

— কেন, কি হয়েছে?

— কি আর হবে। তোমরা তো ভাল করেই জান-আমার চোখের খুব জ্যোতি, অঙ্কের মাথাটাও পরিস্কার। ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ নজরে পড়লো - একটা তারিখের তলায় খুব ছোট্ট একটা কালো ফুট্‌কি। পরের মাসেই তাই........ তার পরের মাসেও......হিসাব করে দেখলাম-প্রথম মাসের তারিখের সঙ্গে দ্বিতীয় মাসের তারিখের মধ্যে আটাশ দিনের তফাৎ। এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ লক্ষ করলাম শেষ তিন মাসের তারিখের তলায় কোন ফুট্‌কি নেই। কিরে সুনন্দ — বিয়ের পাঁচ বছরে ফ্রিতে আনন্দ ফূর্তি করে ঘোরার কি হ'লো?

— জবাব দে? তাতো পারবি না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'ল তো? নে, নে, তাড়াতাড়ি দার্জিলিং যাওয়ার টাকাটা বের কর, টিকিট কাটতে হবে।

স্মৃতি

হুগলী জেলার বলাগড়ে সন্তু জেলে থাকে। যদিও তার একটা উপাধি আছে, দাস। সন্তু দাসের বাড়ি যাব বললে কেউ তার বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু সন্তু জেলের বাড়ি বললে সকলেই এককথায় চিনিয়ে দেবে। গঙ্গার ধারে মাটির এক চালা বাড়ি। আগে খড় ছাওয়া ছিল। বর্ষায় প্রতিবার খড়ের ছাউনী নষ্ট হয়ে যায়। সোনালী রঙের খড়গুলোয় ছাতা ফুটে কালচে হয়ে যায়। আনক কষ্টে গতবছর পুরোনো টালি সস্তায় কিনে চালাটা সারিয়েছে। ঘরামীকে ডেকে ঐ চালা সারাতে নয় নয় করেও টালি নিয়ে সবশুদ্ধ পাঁচ-ছ'শো টাকা পড়েছে। ওর দাওয়ার সামানের খোলা জায়গার একপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে জাল শুকোতে দেয়। শীতকালে গঙ্গায় বেশী মাছ ধরতে যায়না। বাপ ঠাকুর্দার মতো নতুন নৌকা তৈরী করে, পুরানো নৌকা সারায় আর আলকাত্‌রা দিয়ে রঙ করে। মজুরী আজকাল ভালোই পাওয়া যায়। সন্তু ভাবে ফারাক্কায় বাঁধ হওয়ার পর, গঙ্গার জলের স্রোত অনেক কমে গেছে। জোয়ার-ভাঁটাও সেরকম খেলেনা। গঙ্গার জল পুকুরের জলের মত স্থির হয়ে গেছে। গঙ্গার দুপাশে এবং মাঝখানেও অনেক জায়গায় চড়া পড়ে ঘাস গজিয়ে গেছে। আজকাল মাছও সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না। সন্তু মনে মনে ভাবে, আস্তে আস্তে মাছ ধরার কাজ ছেড়ে দিয়ে ত্রিবণীতে বিড়লার কারখানায় কাজের চেষ্টা করতে হবে। ঐ কারখানার ঠিকাদার ঘোষবাবুকে অনেকদিন ধরে বলেছে যদি কাজটাজ পায়। তবে মাছ ধরাটা স্বাধীন ব্যবসা। কারুর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

সন্তু বিয়ে করেছে। ওর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটা বছর দশেকের, মেয়েটা সবে সাতে পড়েছে। সন্তু ছেলেমেয়েকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করেছে। ছেলেটা ক্লাস ফোর ও মেয়েটা ক্লাস ওয়ানে গ্রামের নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। বই ও টিফিন স্কুলই দেয়। মাইনে দিতে হয় না। সরকারই এই সুবিধা করে দিয়েছেন। সন্তু আর ওর স্ত্রী স্বপ্ন দেখে ছেলেমেয়েরা ভাল পড়াশোনা করে শহরের ছেলেমেয়েদের মত ভাল চাক্‌রী করবে। মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে দেবে কিন্তু ছেলেকে জাত ব্যবসায় আর নামাবে না।

হঠাৎ একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ে সন্তুর সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। সন্তুর নৌকা চড়ায় ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। সন্তু ভাল সাঁতারু কিন্তু আগাছায় পা জড়িয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়াতে পাবলো না। আপ্রাণ চেষ্টা করলো জল থেকে মাথা তুলে নিয়ে দম নেবার। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর ও জলের মধ্যে ডুবে গেল। অবশেষে সন্তুর দেহটা পরদিন ত্রিবেণীর কাছে

চড়ায় ভেসে উঠল। দেহটা ফুলে গেছে। চোখগুলো কাকে ঠুকরে গর্ত করে দিয়েছে। ওর নিখোঁজ হবার পরের দিন সকালে বলাগড় পুলিশ ফাঁড়িতে ওর স্ত্রী ডায়েরী লিখিয়েছিল। পরে ত্রিবেণী থান থেকে পুলিশ মারফৎ খবর পেয়ে ওর স্বামীর লাশ ওর দেওয়া হাতের তামা, রুপো দিয়ে বাঁধানো আঙটিটা দেখে সনাক্ত করল। গত বছর নৌকা সারাই করার পয়সায় দশহারার দিন ও তার স্বামীকে হারাণ স্যাক্‌রার কাছ থেকে ঐ আঙটিটা শখ করে করিয়ে দিয়েছিল।

গ্রামের মাতব্বররা বিধান দিল, সন্তুর ছেলে স্বপনই তার বাবার মুখে আগুন দেবে। সন্তুর স্ত্রী এত দুঃখের মাঝেও মৃদু প্রতিবাদ করেছিল যে, স্বপন তো খুব ছোট, ওর কাকাও তো তার দাদার মুখে আগুন দিতে পারে। কিন্তু মাতব্বররা কোন কথাই শুনল না। অবশেষে স্বপনই ত্রিবেণীর শ্মশানে তার মরা বাপের মুখে আগুন দিয়ে, কাছা গলায় পরল।

অপঘাতে মৃত্যু, ফলে তিনদিনে কাজ শেষ করতে হবে। সন্তুর বৌ ছেলের জন্য প্যাঁকাটি জ্বেলে মাটির মালসায় হবিষ্যি রান্না করে। স্বপন কিছুতেই হবিষ্যি খেতে পারেনা। ওর মা অনেক কষ্টে চোখের জল ফেলে, ছেলেকে একটু খাইয়ে দেয়। গরীবের ঘরে আলাদা রান্নার পাট নেই। মেয়েটাকেও ঐ খাবারই খাওয়াতে হয়। ওদের খাওয়ানোর পর নিজের মুখ দিয়ে আর কোন খাবারই নামতে চায় না। ফল, মিষ্টিও সেভাবে কোন আত্মীয়-প্রতিবেশী দেয়না যেটা ওরা মা-ছেলেমেয়ে মিলে খাবে।

স্বপনের যেদিন ঘাট কামানো হবে, সেদিন গ্রামের হারু নাপিত এসে ওকে আর ওর বোনকে খুঁজে না পেয়ে সন্তুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে— ওবৌদি তোমার বেটা বেটি কোথায় গেল ? ঘাট কামান্ হবে তো ?

দেখনা, কাছে পিঠেই কোথাও আছে। ওরা ক'দিন স্কুলেও যাচ্ছেনা। খাবার সময় ছাড়া ওদের পাওয়াই মুস্কিল। হারু ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ঘাটের কাছে গিয়ে দেখে যেখানে নৌকাগুলোকে আল্‌কাতরা মাখিয়ে রোদের শুখোবার জন্য উল্টো করে রেখে দিয়েছে তার একটার মাথায় সন্তুর ছেলে স্বপন লাটাই ধরে আছে আর কিছুদূরে ওর ছোটবোন স্বপ্না ঘুড়িটা ধরে আছে ধর্‌তাই দেওয়ার জন্য। হারুর ডাকে ওরা ভাইবোন কিছুতেই ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে আসবে না। তারপর অনেক কষ্টে হারু অনেক মণ্ডা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে গঙ্গার ঘাটে স্বপনের মাথা ন্যাড়া করিয়ে, ওদের দুই ভাই-বোনকে গঙ্গায় চান করিয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। এত দুঃখের মধ্যেও-ওরা বাবার দেওয়া ঘুড়ি-লাটাইটা হাতছাড়া করেনি। বুকে আঁকড়ে ধরে আছে।

নিঝুম রাতের কান্না

অমাবস্যার রাত। চারদিক নিঝুম। মাঝে মাঝে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানির শব্দ, পেঁচার ডাক, সঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্নার আওয়াজ। সুজিত ওর মা'র কাছে শুয়ে আছে। আগামীকাল ক্লাসে ওঠার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে। তার চিন্তায় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে। হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজে যেটুকু তন্দ্রা ভাব আসছিল সেটাও উধাও। ভয় পেয়ে আরো জোরে মাকে জড়িয়ে ধরল। মার ঘুমটা ভেঙে যেতেই সুজিতকে বললেন—

— কিরে, ভয় পেয়েছিস ? কি হ'ল, অত জোরে আমায় আঁকড়ে ধরলি ?

— মা খুব ভয় লাগছে।

— কেন ? আমি তো তোর পাশেই আছি। ভালো করে শোনো।

— হ্যাঁরে বাবলু, তুই ঠিক বলেছিস। (সুজিতকে ওর মা আদর করে বাবলু বলে ডাকেন।) সত্যিই তো, মনে হচ্ছে খুব কাছেই কেউ গুমরে গুমরে কাঁদছে।

সুজিতের মা ওর বাবার ঘুম ভাঙিয়ে ঐ কান্নার আওয়াজ কোথা থেকে আসছে জিজ্ঞাসা করলেন। ওর বাবা চারদিক ঘুরে এসে বললেন— পান্নালালবাবুর বাড়ি থেকে শব্দটা আসছে বলে মনে হচ্ছে।

পান্নালালবাবু ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে সুজিতদের বাড়ির কাছে কোলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে দু-কামরার বাসা ভাড়া করে থাকেন। ওনার দুই ছেলে, মেয়ে নেই। বড় ছেলে মতিলাল বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির কাছে বসিরহাটে থাকে। শ্বশুরের জায়গা জমি দেখাশোনা করে। শ্বশুরমশাই একটা ছোটখাট মুদিখানার দোকান করে দিয়েছে। সেখানেই ঘরজামাই হয়ে থাকে। বুড়ো বাবা-মাকে বিজয়ার প্রণাম করতে আসা ছাড়া পান্নালালবাবুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই প্রায় নেই। ছোট ছেলে হীরালাল বাবা-মার কাছেই থাকে। খুব কষ্ট করে সংসার চালায়। ও একটা জুট মিলে মেশিনম্যানের কাজ করে। বিয়ে করেছে। দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স পাঁচ বছর, ছোটটা সবে বসতে শিখেছে, এখনও হাঁটতে পারে না।

একদিন বিকেলে হীরালালের ছোট মেয়েটা খুব কাঁদছে। বায়না করছে। হীরালালের বৌ কয়লার তোলা উনুনে আগুন ধরাতে বসেছে। ভিজে ঘুঁটে। ধরতেই চায় না। বেশ বিরক্ত লাগছে। সব বৌয়েরাই প্রায় গ্যাসের উনুনে রাঁধে। ওকেই এত কষ্ট করে কয়লা ভেঙে, ঘুঁটে দিয়ে, পাখার বাতাস করে উনুন ধরাতে হয়। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। কিন্তু

উপায় নেই। এর মধ্যে আবার ওর স্বামীর জুট মিলে লক আউট হয়ে গেছে। কয়লা ভাঙার হাতুড়ি দিয়ে কয়লাগুলো বড়, ছোট, মাঝারী সাইজে ভাঙছে। গুল কয়লাও কিনতে পারেনি। একে বাচ্চা সামলানোর ধকল, তার ওপর এত কষ্ট করে উনুন ধরানো। ছোট মেয়েটা একঘেয়ে কেঁদেই চলেছে। দুধও সময়মত দিতে পারে না, সংসারের ঝামেলার জন্য। বড় মেয়ে পারুলকে চেঁচিয়ে বললো — এ্যাই পারুল, শুনতে পাচ্ছিস না, ছোট বোনটা কাঁদছে। ওকে একটু কোলে নিয়ে ভোলা, সামনে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।

— আমি পারব না, তুমি দ্যাখ। আমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যাবো।

— না, এখন খেলতে যেতে হবে না, বোন্‌কে দ্যাখ।

— আমি পারবো না, ঠাকমাকে বলো ওকে ধরতে। আমি এখুনি খেলতে যাবো। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি।

— অ্যাই পারুল, খুব মুখে মুখে চোপা করা হচ্ছে। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। দাঁড়া।

— না।

— আমি মা হয়ে তোকে বলছি আর তুই একবত্তি ছোট্ট মেয়ে হয়ে মায়ের কথা শুনছিস না — বলে হঠাৎ রাগের চোটে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা পারুলের দিকে ছুঁড়ে মারল।

— ও মা-মাগো বলেই পারুল ছোট ছোট হাত দিয়ে কানের পাশটা ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। পারুলের চিৎকারে ওর দাদু-ঠাকুমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, পারুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পাশে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটাও পড়ে আছে। পান্নালালবাবুর বয়স হয়েছে। যাই হোক কোনরকমে বাড়ি থেকে কঁপাতে কাঁপতে অশক্ত পায়ে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় যেখানে ২০/২২ বছরের ছেলেগুলো আড্ডা মারে সেখানে গিয়ে বললেন — বাবারা, আমার বাড়িতে খুব বিপদ। ছেলেটাও বাড়ি নেই। তোমবা একটু চলো বাবা তাড়াতাড়ি, নাহলে আমার নাতনিটা বেঘোরে মারা যাবে।

ওরা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে পান্নালালবাবুর বাড়ি এসে এই অবস্থা দেখেই নিজেরা চাঁদা তুলে এ্যাম্বুলেন্স করে কোলকাতার মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেল। এমারজেন্সীতে ডাক্তার দেখে বললেন — এখুনি ভর্তি করে নিচ্ছি। ইন্টারনাল্ হেমারেজ। বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে বলতে পারবো না। খুবই সিরিয়াস কেস্। পারুল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। যমে-মানুষে টানাটানি। ৩/৪ দিন বাদে ভোরবেলা সুজিত ঘুম থেকে উঠেই দেখে ওদের বাড়ির কাছেই খুব ভিড়। পুলিশ এসেছে। দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একটা পুলিশের, অন্যটা ম্যাটাডোর। ও দৌড়ে ওর বাবা, মাকে দোতলার বারান্দায় ডেকে আনল। ও ঠিক

বুঝে উঠতে পারলো না এত পুলিশ আর ভিড় কিসের। তারপরই বিকট কান্নাকাটি। ম্যাটাডোর থেকে পাড়ার ছেলেরা ধরাধরি করে পারুলের দেহটা নামিয়ে একটা খাটিয়ায় রাখল। পারুল নড়াচড়া করছে না, কথাও বলছে না। ও খুব অবাক হয়ে পাশেই দাঁড়ানো ওর মাকে জিজ্ঞাসা করলো—মা পারুল নড়ছে না কেন? বলো না মা, কেন? মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, পারুল মারা গেছে।

—মারা গেছে মানে কি? ও আর ওর বোনের সঙ্গে খেলবে না?

—না বাবা, ও আর কোনদিনই ঘুম ভেঙে জাগবে না। চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু বাদেই ওকে ওই ম্যাটাডোর করে গঙ্গার ধারে নিমতলা শ্মশানে নিয়ে যাবে। ও আর কোনদিনই ফিরে আসবে না।

—ফিরে আসবে না কেন?

—ও তুমি বুঝবে না। আর একটু বড় হলে বুঝতে পারবে।

সুজিতের বাবা দোতলার বারান্দা থেকে নীচে নেমে গেলেন পারুলদের বাড়ির সামনে যেখানে অনেক লোক ভিড় করেছে।

মানিকতলা থানার অফিসার ইন-চার্জ অনেক পুলিশ নিয়ে এসেছেন। তিনি পান্নালালবাবুকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিতে বললেন—কি করে পারুলের অত বড় চোট লাগল। পান্নালালবাবুর স্ত্রী ও তার ছোট বৌমা দরজার পাশে একগলা ঘোমটাব আড়ালে কান্নাকাটি করছে। অত লোকের মাঝে বেরোতে পারছে না। বুকটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে। কাছেই মেয়েটা শুয়ে আছে, কিন্তু শেষ আদরটুকুও করতে পারছে না। পান্নালালবাবু ও.সি.-কে বললেন—নাতনি বিকালে খেলতে বেরোচ্ছিল হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায় এবং আঘাত পায়। ও যে মরে যাবে আমরা ভাবতেই পারছি না।

ও.সি. বললেন, দেখুন আপনার বয়স হয়েছে। মিথ্যা কথা বলবেন না। যখন ঘটনাটা ঘটে তখন কি আপনি সামনে ছিলেন?

—না, আমি ঘরের মধ্যে হুঁকোতে তামাক খাচ্ছিলাম। কান্নার আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি—মা আমার মাটিতে পড়ে আছে। ও.সি. বললেন—হাসপাতালে ও যখন বেঁচে ছিল তখন মাঝেমধ্যে জ্ঞান ফিরলে অবচেতন মনে চিৎকার করছিল-মা, আমি আর খেলতে যাবো না, বোনকে ধর্‌ব। তুমি আমায় মেরো না-খুব লেগেছে বলে ভয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে যেত। হসপিটালের ডাক্তারবাবুরা সেই স্টেটমেন্ট আমাদের দিয়েছেন। এক্স-রে রিপোর্টে দেখা গেছে-গাল ও কানের পাশের খুলির একাংশ ভেঙ্গে

গুঁড়িয়ে গেছে। খুব ভারী কিছুর আঘাত না লাগলে এটা সম্ভব নয়। ওর মাকে ডাকুন- থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দু-তিনদিনের মধ্যে পেয়ে যাব। এখন লাশটাকে আপনারা সৎকার করতে পারেন।

হীরালাল ও.সি.-কে বললেন — স্যার, আমার স্ত্রী নির্দোষ। পারুল বাচ্চা মেয়ে ও ঠিক জানে না। আমার কারখানা বেশ কিছুদিন হ'লো বন্ধ হয়ে গেছে। পারুল হোটেলে খাবার খেতে ও বেড়াতে যাওয়ার জন্য খুব বায়না করছিল, আমি যে বায়না মেটাতে না পেরে কয়লা ভাঙার হাতুড়িটা ছুঁড়ে মেরেছিলুম। কিন্তু সেটা যে ওর মাথায় লাগবে বুঝতে পারিনি। আমরা-ওর বাবা মা হয়ে কি করে নিজের মেয়েকে খুন করব স্যার? আপনিই বলুন। হঠাৎ এ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। যা শাস্তি পাওয়ার আমাকে দিন, রেখা কিছু করেনি। ও নির্দোষ।

ও.সি. বললেন — পাড়াব ছেলেরা পারুলকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেছিল-পারুলেব পাশে একটা কয়লা ভাঙা হাতুড়ি পড়েছিল। সেই স্টেটমেন্টের সঙ্গে আপনার স্টেটমেন্টের মিল আছে। ঠিক আছে, আপনিই আমাদের সঙ্গে থানায় চলুন।

ও.সি. হীরালালবাবুকে জীপে তুলে নিয়ে থানায় চলে গেল। সুজিতের বাবা পান্নালালবাবুকে বললেন — আপনি বৃদ্ধ মানুষ ঘরে যান। ক'দিন অনেক ধকল গেছে। আপনি বিশ্রম নিন। সৎকারের ব্যবস্থা আমরা করছি। আপনাকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না।

খুব সুন্দরভাবে কপালে চন্দনের টিপ দিয়ে, ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে, সুগন্ধি অগুরু সেন্ট গায়ে ঢেলে, ধূপ জ্বেলে পাড়ার ছেলেরা ঐ ম্যাটাডোর ভ্যানে চাপিয়ে পারুলকে নিয়ে চলে গেল। সুজিত আর ওর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পারুলের শেষযাত্রার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ও মৃত্যু আগে কোনদিন দেখে নি, কতই বা ওর বয়স। কিন্তু এই বয়সেই এই বিষাদের দৃশ্য ওর মনটাকে খুব ভারি করে তুলল। জীবনের একটা দিক ওর কাছে উন্মোচিত হ'লো।

প্রতি রাতেই পান্নালালবাবুর ছোট ছেলের বৌমার অব্যক্ত কান্নার গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসত। পারুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য হীরালালের আজীবন কারাদণ্ড হয়েছে। জেলের মধ্যে একদিন রেখা, হীরালালের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। হীরালালের চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। মুখে একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রেখাও খুব বিমর্ষ, তার স্বামীকে এই অবস্থায় দেখে। রেখা হীরালালকে খুব নীচু স্বরে শুধোয় — মেয়েকে তো

আমি খুন করেছি। তুমি কেন ধরা দিলে-তোমার এ চেহারা যে আমি সহ্য করতে পারছি না। এর চেয়ে আমার মরণ ভাল।

হীরালাল বলল — অনেক ভেবেচিন্তে এই বিষয়টা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। প্রথমতঃ তুমি জেল খাটলে চিল-শকুনেরা তোমার দেহকে ছিঁড়েকুটে খেত। দ্বিতীয়তঃ ছোট মেয়েটা এখনও তোমার দুধ খায়। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা — সেটা হ'ল-কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে কত লোকই তো আত্মহত্যা করে-আমি না হয় জেলই খাটলাম। তবু তো সংসারে একটা পেট খাওয়া থেকে বাঁচল। জেলের লপ্‌সি খেয়ে ভালই আছি। তুমি চিন্তা কোর না। বাড়ি ফিরে যাও।

গরম জিলিপি

আমার একমাত্র মেয়ে সুচেতার জন্মদিন আমরা প্রতিবারই পালন করি আমাদের সাধ্যমত। ভোরবেলা মেয়েকে স্নান করিয়ে, নতুন জামা পরিয়ে ওর মা মেয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজিয়ে যুঁই ও বেলফুলের মোটা মালা গলায় পরিয়ে দেন। তারপর কিছু পাড়ার ও স্কুলের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে জলখাবার ও দুপুরের খাওয়া একসঙ্গে হৈ হৈ করে সারাদিন ধরে জন্মদিন পালন করা হয়। বিলিতি মতে কেক্ কাটা হয়না, কিন্তু শাকভাজা, শুক্তো, পাঁচ রকম ভাজা, ডাল, মাছ, চাটনী, মিষ্টি ও শেষ পাতে পায়েস। আমার স্ত্রী বলেন — জন্মদিনে অথবা শুভকাজে মাংস খাওয়া ঠিক নয়। মেয়ের জন্মদিনের দিন পনেরো আগে আমার মেয়ে এসে বললো — "বাবা, আমার বন্ধু শবরীকে নেমন্তন্ন করতেই হবে, কিন্তু একটা ঝামেলা আছে। সেটা আমি ছাড়া আর কোন বন্ধু জানেনা।"

— কি ঝামেলা?

— জানো বাবা, ও সকালে জলখাবারের সময় গরম জিলিপি খেতে খুব ভালবাসে। জিলিপি না পেলে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। ওদের বাড়ির কাছে নারায়ণ ময়রার যে মিষ্টির দোকান আছে সেখান থেকে ওর বাবা রোজ সকালে চারটে করে গরম জিলিপি এনে ওকে খাওয়ায়। ওকে কিন্তু গরম জিলিপি না খাওয়ালে সকালবেলা ও আমাদের বাড়ি আসবে না। দুপুরের খাওয়ার আগে আসবে।

— তোর বন্ধুকে নিশ্চয়ই জিলিপি খাওয়াবো। নেমন্তন্ন করার সময় ওকে সকালেই আসতে বল্‌বি।

(২)

মেয়ের জন্মদিন যথাসময়ে এসে গেল। আত্মীয় ও মেয়ের বন্ধু মিলে প্রায় পঞ্চাশজন এসেছে। সকাল থেকে খুব হৈ হৈ হচ্ছে। বাড়িতেই রান্নার বামুন এনে সকালে লুচি, আলুরদম ও গরম জিলিপি দিয়ে জলখাবার শুরু। নিমন্ত্রিতরা বললেন — লুচি আলুরদম তো সকলেই করে, কিন্তু গরম জিলিপি দিয়ে জলখাবার কোথাও খাইনি। শবরীও মহানন্দে রোজ বরাদ্দ চারটের জায়গায় আটটা জিলিপি খেয়ে আমায় বললো — কাকু, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে-সুচেতার জন্মদিনে তুমি গরম জিলিপি করেছো বলে। আমি আটটা খেয়েছি। খুব ভাল লেগেছে। আমি তো জানি তুই গরম জিলিপি খেতে খুব ভালোবাসিস্, সেইজন্য সুচেতা আমায় বলেছে — জলখাবারের মেনুতে যেন গরম জিলিপি

থাকে। দুপুরে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে সকলেই বিকালবেলা যে যার বাড়ি চলে গেল।

(৩)

অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল প্রায় তিন বছর। ওর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেরই হয়ত এতদিনে বিয়ে হয়ে গেছে। কাজের চাপে আমি নিজেও খুব ব্যস্ত। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমাদের অঞ্চলের একটি বড় ফুটবল ক্লাবের আমি সভাপতি। তার হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তারমধ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অন্যতম। ক্লাবের ছেলেরা আমায় ধরেছে,— আগামী রবিবার আপনাকে নিয়ে এলাকায় ঘুরবো কিছু চাঁদা ও রক্তদাতা জোগাড় করার জন্য।

— আমি কিন্তু কারুর কাছে চাঁদা চাইতে পারব না। তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি।

— ছেলেরা সমস্বরে বলল — আপনাকে চাঁদা চাইতে হবে না। সে ভারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আপনি শুধু সঙ্গে থাকবেন। গাড়ীর ব্যবস্থা করেছি। আপনার কোন কষ্ট হবে না। আপনার মত গণ্যমান্য লোক সঙ্গে থাকলে ক্লাবের গুরুত্বটা বাড়ে। চাঁদাটাও ভাল ওঠে।

— ঠিক আছে, তোমরা যখন বলছ, তাই হবে।

(৪)

নির্দ্দিষ্ট রবিবার সকাল ৯টায় আমার বাড়িতে ক্লাবের সেক্রেটারি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গাড়ি নিয়ে হাজির। আমি তৈরী ছিলাম। ওরা আসার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। শুধু স্ত্রীকে বললাম — ফিরতে দেরী হবে।

ঘন্টাখানেক বাদে একটা খুব সুন্দর বড় বাড়িতে ছেলেরা আমায় নিয়ে গেল। বড় গেট দিয়ে ঢুকে দু'পাশে বাগান, তারপর আধুনিক ডিজাইনে দোতলা বাড়ি। একপাশে দুটি গাড়ি রাখার গ্যারেজ। বাড়ির মালিক খুবই অবস্থাপন্ন বলে মনে হল। কলিং বেল টিপতেই দোতলার বারান্দা থেকে একটা কাজের মেয়ে জিগেস করলো কাকে চাই?

— বাড়ির বড়রা কেউ থাকলে আসতে বলো-আমরা এখানকার টাউন ফুটবল ক্লাব থেকে আসছি।

— একমাত্র বৌদি ছাড়া আর কেউ বাড়িতে নেই।

— ওনাকেই বলো আসতে।

— ঐ বাড়ির কাজের মেয়েটি দরজা খুলে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের সোফায় বস্তে বল্লো।
এসি লাগানো বসার ঘরে ঢুকতেই প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। একটু বাদে ঐ মেয়েটা আমায় এসে বললো - আপনি ভিতরে আসুন। বৌদিমণি ডাক্ছেন।

ঐ মেয়েটি আমাকে দোতলায় নিয়ে গেল। খুব অবাক লাগছে। অচেনা বাড়িতে শুধু আমারই ভেতরে আসার অনুমতি মিল্ল-ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছি। এমনসময় একটি খুব সুন্দরী কমবয়সী মহিলা এসে আমায় প্রণাম কবে। বললো — কাকু আমায় আমায় চিন্তে পারছেন ?
— মুখটা চেনাচেনা লাগছে মা, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না। বয়স তো হচ্ছে।
— সেকি ছোটবেলায় আপনাব বাড়িতে কত গেছি, খেলেছি, খাওযাদাওয়া করেছি। আমি সুচেতার বন্ধু শর্বরী।
— আরে তুই শর্বরী! কত বড় হয়ে গেছিস্। খুব অবাক লাগছে তোকে দেখে। কতদিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল বল্তো ?
— তা প্রায় পাঁচ সাত বছর হবে।
— তোর শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য লোকেরা কোথায় ? জামাইকেও তো দেখ্ছি না।
— ওরা ওদের গুরুদেবের আশ্রমে গেছে, গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। প্রসাদ খেয়ে বিকেলে ফিরবে।
— তুই গেলি না কেন ? একা এখানে রয়েছিস।
— আমাকে সব জায়গায় নিয়ে যায়না। বাড়ি পাহারায় থাক্তে হয়।
— তোর খাওয়াদাওয়ার কি হবে ?
— রাঁধুনি, কাজের লোক সব আছে, কোনো অসুবিধা নেই।
— এত বড় বাড়িতে তুই একা থাকবি ভাবলেই কি রকম অবাক লাগছে। তা কতদিন হলো তোর বিয়ে হয়েছে ? জামাই কি করে ?
— আমার প্রায় বছরখানেক হ'লো বিয়ে হয়েছে। বাবা মার একমাত্র ছেলে। কোলকাতার বউবাজারে পৈতৃক সোনার দোকান। ও আর বাবা দুজনেই দেখাশুনা করেন। আমি আর শ্বাশুড়ি মা বাড়ি থাকি। কাগজ দেখে সম্বন্ধ হয়েছিল। আমার বাবা, মাকে বেশী কষ্ট করতে হয়নি।
— তাহলে তো বেশ সুখেই আছিস্।

— জানো কাকু, আমার কাজের মেয়েটা যখন বললো কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন তখন ওপরের জানালা দিয়ে দেখি তুমি এসেছো। সেইজন্য দরজা খুলতে বললাম। অচেনা লোক হলে খুলতাম না। তোমার সাথে অনেকদিন বাদে দেখা হয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে — এখন বলো, কাকীমা আর সুচরিতার খবর কি ?

— কথা বলার ফাঁকে ঠাণ্ডা সরবত, মিষ্টি ঐ কাজের মেয়েটি দিয়ে গেল।

— নীচে থেকে ছেলেরা তাড়া দিচ্ছে। দেরী হয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় যেতে হবে।

— শর্বরীকে আমার আসার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে বললাম — জামাই এলে বলিস্ যদি পারে আমাদের ক্লাবের রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করতে। ও হ্যাঁ, মনে পড়ে গেল — তুই এখনও রোজ সকালে গরম জিলিপি খাস্ ?

শর্বরী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে-চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটিতে পড়ছে। আবহাওয়া হঠাৎ থম্‌থমে হয়ে উঠলো। আমারও খুব অস্বস্তি হচ্ছে। নীরবতা ভেঙে শর্বরী বলল — আমার বিয়ের পর আমার মা, শ্বাশুড়ি মায়ের হাত ধরে বলেছিল — দিদি আমার একমাত্র মেয়েকে আপনার হাতে দিলাম। ও খুব আদরে আমাদের কাছে মানুষ হয়েছে। সকালে জলখাবারের সময় গরম জিলিপি খেতে খুব ভালোবাসে। আমার একটাই আব্দার আপনার কাছে।

— একমাত্র ছেলের বৌ করে যখন আপনার মেয়েকে এনেছি তার ব্যাপার আপনি আর মাথা না ঘামিয়ে আমাকেই ঘামাতে দিন। এ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ছোট লোকেরা জিলিপি খায়। আমাদের বাড়িতে ওসব ছোটলোকের খাওয়া কেউ খায় না।

বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে নেমে এসে ক্লাবের ছেলেদের বললাম — শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। জীবনের রোজনামচা বুঝি এভাবেই বদলে যায়। তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে চল। বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা হচ্ছে।

মানে কথা - সবই তাঁর ইচ্ছে

আমাদের পাড়ায় কিছুদিন হলো এক দম্পতি নতুন বাড়ি করে এসেছেন। ঐ ভদ্রলোক মানে রমেশবাবু কাছেই একটা জুট মিলে ফিটারের কাজ করেন। এক ছেলে-বয়স প্রায় ছয়-সাত বছর হবে-একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ে। তিনি খুব সাধারণভাবেই জীবনযাপন করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যখন বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও বেরোন তখন বেশ দামী শাড়ী, ম্যাচিং করা ব্লাউজ, হ্যাণ্ড ব্যাগ, চটি, মায় সুন্দর ডিজাইনের সৌখিন গয়নাও পরেন। ছেলেটিও খুব দামী জামা-প্যান্ট পরে। পাড়ার সকলেই আড়ালে-আবডালে আলোচনা করেন — জুটমিলের ফিটারের কাজ করে রমেশবাবু এত টাকা পরিবারের জন্য খরচা করেন কি করে? নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে মাঝবয়সী পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক, সেন বাড়ির রকে রোজই সকাল-সন্ধ্যে আড্ডা মারেন। পাড়ার কোথায় কে কি করছেন, কাব বাড়িতে কি রান্না হ'লো, কার বৌ স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গেল, কার মেয়ে একটা মাস্তানকে বিয়ে করে পালিয়ে গেল থেকে শুরু করে— রাজনৈতিক দলে কে ভুল, কে সঠিক, ক্রিকেট, ফুটবল খেলোয়াড়, যারা দেশের হয়ে খেলছে তাদের ভুল ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করছে অথচ তাদের নিজেদের খেলার দৌড়, ইঁট সাজিয়ে উইকেট আর ক্যাম্বিস বল তৎসহ কাঠ চেরাই কল থেকে খানিকটা বাজে কাঠ চেয়ে এনে কাটারি দিয়ে হাত ধরার জায়গা ঠিক করে ব্যাট তৈরি করে খেলা। অনেকসময় হাতে কাঠের চোঁচ ঢুকে যায়। তারা যেন সব ব্যাপারেই বিরাট বোদ্ধা। সাব ডিভিশনে যে সমস্ত ক্লাব খেলে তাদের ধাবেকাছেও কোনদিন খেলার সুযোগ পায়নি।

এ রকের সামনে দিয়ে একদিন রমেশবাবু বাজারের থলি হাতে আপনমনে হেঁটে চলেছেন। বাজারের দিকে। এমন সময় রক থেকে আওয়াজ উঠল — ও রমেশবাবু, এ পাড়ায় নতুন এসেছেন, এমন ভাব করেন যেন আমাদের চেনেন না। আপনার কোন বিপদ হলে আমাদেরই পাশে পাবেন, অন্য কাউকে নয়। তা আপনি তো জুট মিলে কাজ করেন-আপনার গিন্নির সাজ-পোশাক দেখলে তো মনে হয় না।

রমেশবাবুর একটা মুদ্রাদোষ ছিল — হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ঢঙে দাঁড়িয়ে পড়ে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে বলেন — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে। এই কথা বলে আবার বাজারের পথে হাঁটা দিলেন। রকের উৎসাহী সদস্য হেবো বললো-এ্যাদ্দিনে একটা খদ্দের পেয়েছি। এবার থেকে যখনই রমেশবাবু ঐ রকের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন

তখনই হেবোরা রমেশবাবুর উদ্দেশ্যে কিছু বলে, আর অন্যান্য দিনের মতো রমেশবাবু তখনই ঐ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ে রোজকার মতোই বলেন — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে। রমেশবাবুর দেখাদেখি ওর ছেলেও ঐ রকম মুদ্রাদোষ পেয়েছে। একদিন সকাল দশটার সময় পাড়ার রকের সামনে দিয়ে রমেশবাবুর ছেলে সুদীপ পায়চারি করছে আর বিড়বিড় করে আপনমনে কি সব কথা বলছে। রক থেকে যথারীতি আওয়াজ উঠল — ও খোকা, তোমার নাম কি? সুদীপ। তা সুদীপ, তুমি এখন বাড়িতে পড়াশোনা না করে রাস্তায় কাঠ ফাটা রোদ্দুরে, গরমে ঘোরাঘুরি করছ কেন? ঐ ছেলেটিও ওর বাবার মত ভঙ্গী করে বল্ল — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে। শালা, মা টা খুব বদমাইশ, পাজী, ছুঁচো — যেই মামা এলো অমনি মা আমায় বলল — খোকা মামা এসেছে, আমরা দরকাবি কথা বলবো। তুই খানিকটা রাস্তায় ঘুরে আয়। মামা দশটা টাকা দিয়ে বললো, পেপসি, কোক, চকলেট-তোর যা ইচ্ছে হোক কিনে খাবি। ঘন্টা দুয়েক পরে বাড়ি আসিস্। আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে এখন শালারা মনের আনন্দে গল্প করবে। অমি যেন কিছু বুঝিনা। আমার তো পাঁচ মিনিটেই টাকা খরচ হয়ে গেলো। হেবো আর মান্তুব মায়া হল বললো — শোন মামাকে বলবি বাজার দর বেড়ে গেছে এখন আব দশ টাকায় কিছু হয়না। ক্ষিদে পেয়ে যায়। একঘন্টা বাইরে থাকলে কুড়ি টাকা, দুঘন্টায় চল্লিশ টাকা লাগবে। তাহলে দেখ্‌বি তোর মামা অত টাকা খরচও করবে না, তোকে আর বাড়ির বাইরে রোদ্দুরে ঘুরতেও হবে না।

দিন দুয়েক পরে রমেশবাবুর ছেলে সুদীপ আনন্দে লাফাতে লাফাতে এসে টিপ্ করে হেবো আর মান্তুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো — সত্যি, তোমাদের মতো এত ভালো লোক দেখিনি। আগে মামা দশ টাকা দিয়ে কাজ সারতো, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে চল্লিশ টাকা পেয়েছি। কালু বলে উঠলো — শোন্, আমাদেব বুদ্ধিতে চল্লিশ টাকা পেয়েছিস, আমাদের কমিশন দশ টাকা দিবি, নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে। — হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দোব, তোমাদের জন্যেই তো এত রোজগার।

হেবো আর মান্তু কালুকে ঝাঁঝিয়ে উঠল — তুই মরলে নরকেও জায়গা পাবি না। এত নীচ তুই, ওইটুকু বাচ্চা ছেলের কাছেও কমিশন খাচ্ছিস।

কালু বললো — সেকি! টাকাটা কি আমার জন্যে নিচ্ছি। জনগণের সেবার জন্যে নিচ্ছি। এতে কোন পাপ নেই। রাজনৈতিক দাদারাও তো কমিশন খায় জনগণের জন্যে। তাদের হলে দোষ নেই, তারা মহান। আর আমি নিলেই দোষ।

হেবো বলল — তোর জনগণ কারা ?
কালু বলল — কেন তোরা, দু'বাণ্ডিল বিড়ি আর তিন ভাঁড় চা তো হবে ।
মান্তু বললো — তোর খুব বুদ্ধি মাইরী, জীবনে উন্নতি হবে । আমি এই অবেলায় তোকে আশীর্বাদ করছি ।

রমেশবাবুর ছেলে যত বড় হতে লাগল, মামার কাছে আব্দারের মাত্রা সাড়ে তেত্রিশ বেড়ে চলল । আগে লুকিয়ে চুরিয়ে এক আধটা সিগারেট টান মারত, এখ ন প্যাকেট রাখে পকেটে । পাড়ার সরস্বতী পুজোয় প্যাণ্ডেলে রাত জাগত ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে । সেখানেই সিগারেট খাওয়ার হাতেখড়ি । দূর্গাপুজোর ভাসানের সময় বন্ধুরা বলল — একটু সিদ্ধি আজকের দিনে খেতে হয়, তাহলে প্রসেশনে গেলে হাঁটার ক্লান্তি অনুভব করা যায়না । কালীপুজোর সময় রাত্রে প্যাণ্ডেলে পাহারা দেবার নাম করে বাড়ি থেকে রাতের খাওয়া সেরে সুদীপ তাড়াতাড়ি প্যাণ্ডেলে চলে আসে । বন্ধুরা বলে — জানিস্, কালীপুজো মানে, মায়েব পুজোতে কারণবারি ছাড়া পুজো হয়না । দেখবি একটা মাটির সরায় কারণবারি ঢেলে পুরুত মশাই মাকে পুজো করবে । তারপর এটা প্রসাদ হিসাবে পান করে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে বাড়ি চলে যাবে । এতে কোন দোষ নেই । খা, খেয়ে নে । যারা চুল্লু খায়নি তাদের জীবন বৃথা । বাঙালীর গর্ব চুল্লু । এটা কুটির শিল্প । নেশাখোরের সূতিকাগার পুজো প্যাণ্ডেলে রাত জাগা । এইভাবে শিবরাত্রির দিন পাড়ার শিবদূর্গা পুজোর প্যাণ্ডেলে সুদীপ রাত জাগতে গেল । বন্ধুরা যথারীতি বলল — বাবা গ্যাঁজা খেতেন । আজকের দিনে গ্যাঁজা খেতে হয় । ছোট মাটির কল্‌কেতে গ্যাঁজা পুরে তাতে আগুন ধরিয়ে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়াব টুকরো জড়িয়ে এক এক জন বন্ধু একটান দিচ্ছে তারপর অন্যজনকে এগিয়ে দিচ্ছে । ওর কাছে যখন কল্কেটা এল তখন ও ভাবছে গ্যাঁজার কল্কেতে টান দেবে কি দেবেনা । এমন সময় ওর প্রাণের বন্ধু পচা বলল — নিঃশ্বাসটা ফেলে একদমে যতটা পারবি ধোঁয়াটা টেনে নিবি তারপর খুব আস্তে আস্তে নিঃশ্বাসটা বার করবি, দেখবি দারুণ মজা লাগছে । সুদীপ পচার কথামত কাজ করল । প্রথম টান, সেইজন্য সুদীপ খুব কাশতে লাগল, মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল । কিন্তু ওর মনে তখন খুশীর জোয়ার, মনটা যেন পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে । খুব স্ফূর্তি, খুব আনন্দ । বাড়িতে এখন আর মা অথবা মামাকে সুদীপকে বলতে হয়না-দু ঘন্টা ঘুরে আয়, টাকা দিচ্ছি । মামা বাড়িতে ঢুকলেই ও হাত বাড়িয়ে দেয়, মামা টাকা দেন । ও নীববে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্লাবে চলে যায় ক্যারম খেলতে । সেনবাবুর রকে হেবোরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে কোলকাতার বড়বাজারের

সোনাপট্টিতে সুদীপের মামা মানে সাহাবাবুর দোকান আছে। উনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় ওদেশের পাট চুকিয়ে লুকিয়ে অনেক সোনা এদেশে নিয়ে এসেছিলেন, তারপর সোনাপট্টিতে দোকান খুলে বসেছেন। সুদীপের মা ওঁর দূর সম্পর্কের কি রকম যেন বোন হ'ন সেই সুবাদে মামা।

একদিন ঐ রকের সামনে দিয়ে রমেশবাবু ডিউটিতে যাচ্ছিলেন। খুবই তাড়া ছিল, দেরী হয়ে গেছে এমন সময় কালু বলল — ও দাদা, আপনি বাড়ি না থাকলে আপনার সম্বন্ধী বাড়িতে আসে, ব্যাপারটা কি ? কি রকম একটু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি। রমেশবাবু যথারীতি দাঁড়িয়ে পড়ে হাতটা আকাশের দিকে তুলে বললেন — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে। তবে দাদা, আমার তো কোন সম্বন্ধী নেই। কালু বল্‌ল — ভাল করে খোঁজ নিন জানতে পারবেন। রমেশবাবু হন্তদন্ত হয়ে জুটমিলের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। একে দেরী হয়ে গেছে তায় সেনবাবুর বাড়ির রকের লোকেরা এইসব কথা বলায় মনটা খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন — পাড়ার লোকেরা জানে, অথচ আমি নিজেই জানিনা। এই স্ত্রী ও সংসারের জন্য এত পরিশ্রম করি অথচ নিজের ঘরেই এই বিপদ। এইসব চিন্তা করতে করতে বড় রাস্তা পেরিয়ে মিলের গেটে ঢুকতে যাবেন এমন সময় একটা লরীর চাকা তাঁকে রাস্তায় পিষে দিয়ে চলে গেল। কোমরের অংশটা পিচ রাস্তার সঙ্গে লেপ্টে গেল। মাথার অংশ ও পায়ের অংশটা রক্তের সমুদ্রের মাঝে বিদ্যমান। মিলের দারোয়ান দৌড়ে এসে দেখল রমেশবাবু মৃত। মিলের ম্যানেজারকে খবর দিল, লোকে লোকারণ্য। থানা, পুলিশ, নানা হাঙ্গামা পুইয়ে সুদীপ ওর বাবার পারলৌকিক কাজ খুব শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে সমাপ্ত করলো। তাতে নিষ্ঠার কোন খাদ ছিল না। অপঘাতে মৃত্যু বলে তিনদিনেই কাজ শেষ। তারপর থেকেই সুদীপ কি রকম গম্ভীর হয়ে গেল, নেশা করা প্রায় ছেড়ে দিল। মন দিয়ে পড়াশুনা করে। ইতোমধ্যে বাবার মিল থেকে প্রাপ্য টাকা-পয়সা, ইনসিওরের ক্লেম ও পলিসির টাকা পেল। মার নামেই নমিনি করা ছিল। ফলে তার মা ঐ টাকা ভাঙিয়ে পোস্ট অফিসের এম.আই.এস. ও ব্যাঙ্ক স্থায়ী মেয়াদী আমানতে রাখল। তার সুদেই তাদের সংসার চলে। তাদের বাড়িটা একতলা ছিল। মামা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দোতলাটা করে দিলেন। আধুনিক ডিজাইনে, মেঝেতে মার্বেল বসিয়ে, দেয়ালে প্লাসেম রং করে ঐ বাড়িটাকে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে দিলেন। নতুন ধরণের আসবাবপত্র, খাট, আলমারী দিয়ে দোতলাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। পুরানো আসবাবপত্র নিচের ঘরেই রয়ে গেল। বাড়ির প্রধান দরজার গেটের পাশে মার্বেল পাথরে কালো

কালিতে লেখা "সুদীপ ভিলা" পাথরটা যখন রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে দিল তখন সুদীপ মনে মনে একটু খুশী যে হয়নি তা নয়, তবে বাবার আর কোন চিহ্ন রইল না। মামা বললেন — সুদীপ তুমি বড় হচ্ছ, দোতলাটায় তুমি থাকবে। কোন জিনিষের প্রয়োজন হলে আমায় জানিও। আমি আর তোমার মা ছাড়া তোমার অসুবিধার আর কে খোঁজ নেবে বল। কোন সঙ্কোচ কোরো না।

সুদীপ বড় হয়েছে। ইংরাজী অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ে। মামার মুখের ব্যবহারটা এত ভাল যে মার সঙ্গে অবৈধ মেলামেশার ব্যাপারটা বুঝেও মুখে কিছু বলতে পার না। তিনি সুদীপদের সংসারে কোন অভাব রাখেন নি। তাঁর চেষ্টাতেই সুদীপ নতুন করে পড়াশুনা করছে। এখন আর মামা বাড়িতে এলে তাকে বাড়ির বাইরে যেতে হয়না। দোতলার ঘরে নিজেই পড়াশুনা নিয়ে থাকে। মা আর মামা একতলাতেই থাকেন। এখন মামা আর দিনের বেলায় আসেন না, রাত্রে বড়বাজারের দোকান সেরে আসেন। তাঁরও বয়স হচ্ছে। কোন কোন দিন রাত্রিবাসও করেন। সুদীপের গা সওয়া হয়ে গেছে ব্যাপারটা। ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। এখন বুঝেছে, টাকাটাই সংসারে সব কিছু। টাকা না থাকলে কেউ পাত্তা দেয়না। তবে ওর মার সঙ্গে বাক্যালপ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও খরচ করে না। অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। সুদীপ ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করে কোলকাতার কাছে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়াচ্ছে। বিয়ে করেছে, এক পুত্র সন্তানের পিতা। নিজের বাড়ির দূষিত পরিবেশের কারণে ওর স্ত্রীকে তার বাবা মায়ের কাছেই রেখে দিয়েছে। শনিবার স্কুল সেরে শ্বশুরবাড়ি যায়, সোমবার সকালে স্কুল সেরে বাড়ি ফিরে আসে। ইতোমধ্যে মামাও প্রয়াত হয়েছেন। ওর মা একদিন সুদীপকে বললেন — খোকা, বৌমা আর নাতিকে একদিন এখানে নিয়ে আয়। কতদিন নাতিকে দেখিনি। খুব আদর করতে ইচ্ছে করে।

— তুমি তো সে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছো। তোমার ঐ পাপের শরীরের ছায়া আমার ছেলের ওপর পড়তে দেবো না। সুদীপের মা সুতপাদেবী বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েন। নীরবে মুখ নীচু করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। নিজের গর্ভের একমাত্র সন্তান আজ এতবড় অপমান করবে স্বপ্নেও চিন্তা রতে পারেন্ নি। ছোটবেলায় পড়া দস্যু রত্নাকরের গল্প মনে পড়ে যায়। সংসারকে স্বচ্ছ, স্বাভাবিক রাখতে নিজে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েছেন। কিন্তু শেষ জীবনে নিজের ছেলের কাছে এই অপমান সহ্য করা যায়না। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ঘরের আলো নিভিয়ে নাইট ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলেন। খাটে শুয়ে অনেক চেষ্টা করলেন

চোখ বুজে ঘুমোনোর জন্য। কিন্তু নানান চিন্তা মাথায় ঘুরেফিরে আসছে। উঠে একগ্লাস জল পান করলেন। দূরে ঘড়িতে এক ঘন্টা বাজার আওয়াজ কানে এলো। রাত একটা বাজে। এখনও ঘুম আসছে না। ফুল স্পীডে পাখা চালিয়েও ঘেমে উঠেছেন। বাথরুমে গিয়ে মুখে-ঘাড়ে জল দিয়ে এসে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পডলেন। ঘুম ভাঙলো সকাল আটটাব পব। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সুদীপ স্কুলে বেরিয়ে যেতে তিনি প্রথমেই ঐ এলাকার নামকরা উকিলের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললেন— উকিলবাবু, খুব বিপদে পড়ে আপনাব কাছে এসেছি। আমার স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হয় আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। আমি আমার স্থাবর সম্পত্তি উইল করতে চাই। আমি যতদিন জীবিত থাকব আমার। আমার মৃত্যুর পর আমার নাতি সুজিত সাবালক হলে পাবে।

উকিলবাবু বললেন— কেন আপনার ছেলে মেয়ে নেই?

সুতপাদেবী বললেন— আছে কিন্তু তাকে সবাসরি দিতে চাইছি না। আমার নাতি যতক্ষণ না সাবালক হচ্ছে তার দেখাশুনার জন্য তার পিতা মানে আমার একমাত্র সন্তান শ্রী সুদীপ চ্যাটার্জী দেখাশুনা করবে কিন্তু ঐ সম্পত্তি বাঁধা দেওয়া বা বিক্রি কবতে পারবে না। এজন্য যা টাকা লাগবে আমি দিতে রাজি আছি। ঐ দিনই ব্যাঙ্কে গিয়ে তাঁর যা জমা টাকা ছিল, মেয়াদী আমানত ছিল সব নাবালক নাতির নামে নমিনি করে দিলেন। এর আগে তাঁব ছেলের নামে নমিনি ছিল, সেটাকে চিঠি দিয়ে বাতিল করলেন। পরের দিন সকাল ঠিক দশটায় গিয়ে পোষ্ট অফিসে তাঁর যে সব এম.আই.এস.-এ টাকা জমানো ছিল এবং পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল সব জায়গায় তাঁর ছেলের নাম বাতিল করে দিলেন। সমস্ত কিছু তাঁর নাবালক নাতির নামে করে দিলেন।

বাড়ি ফিরে এসে খুব খুশি খুশি লাগছে। বুকের ভারী বোঝাটা অনেক হাল্কা হ'ল। পাশের বাড়ির গিন্নির কাছে বিকালে গল্প করতে গেলেন। ঐ ভদ্রমহিলা সুতপাদেবীর সমবয়সী। পাশের বাড়ি, বেল বাজাতেই ঐ ভদ্রমহিলা দরজা খুলে হাসিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন — কি ব্যাপার, আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি? আজকাল বাড়ি থেকে আপনাকে বেরোতেই দেখি না। আসুন, ভিতরে বসে গল্প করি। — চা খেতে খেতে সুতপাদেবী বললেন— হ্যাঁ ভাই যেজন্যে এখানে আসা সেটাই বলি। আপনার দাদার ঐ ভাবে মারা যাবার পর মনটা খুব ভেঙে গেছিল। তখন মনে একটাই চিন্তা, কি করে ছেলেটাকে বড় করব, লেখাপড়া শেখাব, মানুষ করব। ও মারা যাবার পর জগৎটাকে নতুন করে চিনতে

পারলুম। অনেক লড়াই, সংগ্রামেব মধ্যে দিয়ে আজ আমার ছেলে ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করে স্কুলে পড়াচ্ছে। নিজের পছন্দমত বিয়ে করেছে, একটা নাতিও হয়েছে। কিন্তু বৌমা তার ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি থাকে। কত সাধ ছিল একমাত্র ছেলের বিয়েতে খুব আনন্দ করব, পাড়া প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করব; কিন্তু আমার পোড়া কপাল। তা আর এজন্মে হোল না। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কিছুদিন ধরে দেখছি ছেলেটা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। কি সব চিন্তা করে। নিজের মনে বিড়বিড় করে বকে। আমাকে দেখলেই মুখটা ইস্পাত কঠিন হয়ে যায়। চোখ দুটো যেন জ্বলতে থাকে। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। যদি কখনও আমার বাড়ি থেকে চিৎকার, চেঁচামেচি, ঝগড়ার আওয়াজ পান তাহলে বুঝবেন আমি খুব বিপদে পড়েছি। সুতপাদেবী ঐ ভদ্রমহিলার দু'টি হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে বললেন — দিদি, বিপদে আমায় বাঁচাবেন তো ? বলুন কথা দিন। ঐ ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বললেন — কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা তো আছি। আর আপনি জানেন কিনা জানি না আমি এলাকার মহিলা সমিতির দায়িত্বে আছি। কোন ভয় নেই।

সুতপাদেবীর মনটায় এবার একটু শান্তি হ'ল। নিজের বাড়ি ফিরে এলেন। রাত্রে ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে নিজের ঘরের আলমারির লকারটা খুলে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসের পাশবুক, মেযাদী আমানতের রসিদ, গহনা সব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। নাঃ, কোন ভয় নেই। সব ঠিক আছে। আগামীকালই সব গহনা ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসতে হবে। কখন কি হয় কে বলতে পারে।

কয়েকদিন পর হঠাৎ দুপুরবেলা টেলিফোন বেজে উঠল — দিদি, খুব বিপদ, মার হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে গেছে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। ডাক্তার এসে দেখেছেন। এক্ষুণি হসপিটাল নিয়ে যেতে হবে।

বাপের বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ফোনটা পেয়েই কোনরকমে শাড়িটা পাল্টে কিছু টাকা নিয়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যদি টাকার প্রয়োজন লাগে সেইজন্য সঙ্গে.........

সুতপাদেবীর বাড়ি থেকে ওনার বাপের বাড়ি বাসে আধঘন্টার পথ। সব ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় নটা বাজল। বেল টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে ছেলে সুদীপ গম্ভীরমুখে দরজা খুলে ওপরে নিজের ঘরে উঠে গেল। বাড়ি ফিরে দেখেন-আলমারির চাবি খোলা, জিনিষপত্র ছড়ানো, অগোছালো হয়ে গেছে। বুকটা ধড়াস্ কর উঠল। খাটে

ধপাস্ করে বসে পড়লেন। মার শরীর খারাপের কথা শুনে দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে গেছলেন। চাবি সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা মাথায় আসেনি। এইসব কথাটা ভাবছেন এমন সময় ঘরের আলো নিভে গেল। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। খাট থেকে নেমে যে বাতিটা জ্বালাবেন সেটাও পারছেন না। ভয়ে যেন দেহটা অসাড় হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে গলায় কি একটা লাগল সাপের মত লম্বা। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

আশেপাশের বাড়ির সব আলো জ্বলে উঠল। জানালাগুলো খুলে প্রতিবেশীরা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলেন-ঐ চিৎকারের উৎসের সন্ধানে। যে পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার কাছে কিছুদিন আগে সুতপাদেবী গেছিলেন এবং তাঁর আসন্ন বিপদের কথা জানিয়েছিলেন তিনি আশেপাশের লোকেদের জড়ো করে সুতপাদেবীর বাড়ির দরজায় উপস্থিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে সুতপাদেবীর ছেলে সুদীপ দরজা খুল্‌ল। ঐ ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন — তোমার মা কোথায়?

— জানি না বলে আর বাক্যব্যায় না করে ওপরে চলে গেল। একে অন্ধকার, তায়, অচেনা বাড়ি। যাইহোক এক ভদ্রলোকের পকেটে টর্চ ছিল। তিনিই পথ প্রদর্শক হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছু পিছু ঐ ভদ্রমহিলা ও আরও সকলে প্রবেশ করলেন। এঘর-ওঘর খুঁজতে খুঁজতে সুতপাদেবীর ঘরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলতেই দেখেন — সুতপাদেবীর চুল উস্কো খুস্কো, চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মুখটা বেঁকে গেছে। কাপড় অবিন্যস্ত, খাট থেকে পা দুটো মাটিতে ঝুলছে। খাটে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। সকলেই ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে হতবাক। ইতোমধ্যে এক ভদ্রলোক টর্চ নিয়ে গিয়ে দেখেন বাড়ির ইলেকট্রিকের মেন সুইচ বন্ধ। তিনি সুইচটা ঠিক করে জ্বালাতেই আলো জ্বলে উঠল। উপস্থিত সকলে ঐ দৃশ্য দেখে সুদীপের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। সুদীপ ধীর পায়ে নীচে নেমে এলো। সকলে বললেন

— তোমার মা এই অবস্থায় পড়ে আছেন আর তুমি ওপরে বসে আছো।

— আমি তো জানিনা মার কি হয়েছে? আপনাদের দরজা ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ পেয়ে নীচে এসে দরজা খুলে দিয়ে ওপরে চলে গেছি। ভেবেছি আপনারা মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

— তুমি কিরকম ছেলে? তোমার একবারও মনে হল না এতরাত্রে কেন তোমার মার কাছে আমরা এসেছি। কোন কৌতূহলও নেই।

— না-আমি অন্যের ব্যাপারে মাথা গলাই না এবং অন্য কেউ আমার ব্যাপারে অযথা

মাথা গলাক সেটাও পছন্দ করিনা। এইভাবে ছেলেটা অপমান করবে পাড়ার লোকেরা কেউ ভাবতে পারেনি। এক প্রতিবেশী পাড়ারই এক ডাক্তারবাবুকে বাড়ি থেকে ডেকে আনলেন। তিনি নাকের কাছে হাতটা রাখলেন, চোখের পাতা টেনে দেখলেন, তারপর গলার কাছে কালো একটা দাগ দেখে বললেন — আমি ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। বডি পোস্টমর্টেম করতে হবে। এখুনি পুলিশে খবর দিন। ইনি অন্ততঃ ঘন্টাখানেক আগে মারা গেছেন। পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যখনই সুতপাদেবী চিৎকার করে উঠেছিলেন তারপরই মারা গেছেন। এক উৎসাহী ভদ্রলোক পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে থানায় ফোন করে সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে জানালেন। সুদীপ তাঁর হাত থেকে মোবাইল ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছিল যখন তিনি ফোন করেছিলেন। অন্যান্য প্রতিবেশীরা সুদীপকে ধরে ফেল্ল। সুদীপ চিৎকার করতে লাগল — আমার মা মারা গেছেন আর আপনারা মজা লুটতে এসেছেন। এখুনি বেবিযে যান আমার বাড়ি থেকে। মাকে সৎকার কবতে দিন। পাশের বাড়ির সমীরবাবু বললেন — তুমি তো ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া পোড়াতে পাববে না। সুদীপ বলল — আমাব ব্যাপারটা আমাকেই ভাবতে দিন। সমীরবাবু বললেন — তোমার মা আমার স্ত্রীকে কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন-কোনরকম চিৎকার/আওয়াজ শুনলে তিনি যেন এ বাড়ি এসে তোমার মাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। আজ তোমার মার চিৎকারের আওয়াজ পেয়ে আমরা এসে এই অবস্থায় তোমার মাকে দেখে খুবই অনুশোচনায় ভুগছি যে-তিনি আগে বলা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না। তুমি এখন আমাদের কাছেই থাকবে। এখুনি পুলিশ এসে যাবে। পুলিশের অনুমতি নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যেও-আমরা বাধা দেব না।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ ফটোগ্রাফার সহ এসে হাজির। লাশটার বিভিন্ন ভঙ্গীতে ফটো তোলা হল। ঘরটায় তল্লাশি করে খাটের তলা থেকে একটা দেড়-দুহাত লম্বা সিল্কের শক্ত দড়ি পাওয়া গেল। সেটাকে সাবধানে তুলে নিয়ে থানার বড়বাবু সুদীপকে বললেন — আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। একজন কনস্টেবলকে বললেন বাড়িটা সিল্ করে দাও।

বড়বাবু পুলিশের দল সহ সুদীপকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলি থেকে বড় রাস্তার দিকে চলতে লাগলেন। বড় রাস্তায় পুলিশের ভ্যানটা দাঁড় করানো আছে। প্রতিবেশীরা বড় রাস্তা অবধি পুলিশের সঙ্গে যাচ্ছেন। কি হয় কি হয় একটা ভাব সবার মনে। এমন সময় সেনবাবুদের রকের কাছটায় আসতেই হেবো, মান্তু, কালু সমস্বরে চিৎকার করল — এই

সুদীপ, কি ব্যাপার রে ? এত রাতে পুলিশের সঙ্গে ? হেবো, মান্তু, কালু সবই জানে। সেইজন্যে রকে বসে সুদীপের জন্য অপেক্ষা করছিল। এখন না জানার ভান করে সুদীপের কাছ থেকে জানতে চায়। সুদীপও যথারীতি ওর বাবার মত দাঁড়িয়ে পড়ে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে ভাবলেশহীনভাবে বলল — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে। তারপর পুলিশের সঙ্গে বড়রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। থানায় এসে বড়বাবু সুদীপকে সব ঘটনা বলতে বললেন। এর আগে সুদীপের বাড়িতে প্রতিবেশীদের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুদীপের স্টেটমেন্টের গরমিল দেখা গেল। সুদীপকে হাজতে পাঠালেন যতক্ষণ না কোর্টে কেস ওঠে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে জানা গেল গলায় ফাঁস দিয়ে সুতপাদেবীকে হত্যা করা হয়েছে। সিল্ক জাতীয় দড়ি দিয়ে যাতে তার গলায় দড়ির দাগ ফুটে না ওঠে। সুতপাদেবীর খাটের তলায় পাওয়া সিল্কের দড়ি ফরেনসিক রিপোর্টে পাওয়া গেল সুদীপের হাতের ছাপ। তিনদিন বাদে কোর্টে কেস উঠতেই উকিলের ক্রমাগত জেরার মুখে সুদীপ ভেঙে পড়ল — স্বীকার করল ঐ ওর মাকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলেছে।

জজ সাহেব ওকে জিজ্ঞাসা করলেন — এত বড় অপরাধ কেন করলেন ? আপনি তো শিক্ষক, নিজের মাকে হত্যা করলেন। আপনি ছাত্রদের কি শিক্ষা দেবেন ?

— স্যার আমার দিদিমার শরীর খারাপের খবর পেয়ে আমার মা যখন মামাবাড়ি গেলেন তারপর আমি বাড়ি ফিরে দেখি মা আলমারির চাবি ফেলে চলে গেছেন। সবসময় মা ওই চাবি সঙ্গে রাখতেন। কখনও চাবি ফেলে যেতেন না। আমি কৌতূহলবশতঃ মার আলমারি খুলে দেখি তিনি বাড়ির উইল করেছেন। ব্যাঙ্কের সেভিংস এ্যাকাউন্ট, মেয়াদী আমানতের এবং পোষ্ট অফিসের এম.আই.এস.-এর টাকার নমিনি আমার নাবালক পুত্র, যার এক বছর বয়স তার নামে করে গেছেন। সে সাবালক হলে পাবে। গহনা লকারে রেখে গেছেন। লকার ভাড়াও সেভিংস এ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিবছর কেটে নেবে। এখানেও আমার ছেলে সাবালক হলে তার উত্তরাধিকারী হবে। আমি একমাত্র পুত্র সন্তান। আমি বর্তমানে কিছুই পাবো না। তাই আর রাগ সামলাতে পারিনি। মা, মামার বাড়ি থেকে ফেরার পরই খুন করে দিয়েছি। আমি স্যার হঠাৎ রাগের মাথায় করে ফেলেছি। মার্জ্জনা করবেন।

জজসাহেব তাঁর রায়ে সুদীপকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। রায়ের খবর পরদিন সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। সেনবাবুর রকে হেবোরাও এই নিয়ে আলোচনায়

মশগুল, এমন সময় কালু রক থেকে নেমে সুদীপ আর ওর বাবা রমেশবাবুর মত ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভঙ্গীতে বলল — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে। ইতোমধ্যে ঐ রকের সামনে দিয়ে সমীরবাবু যাচ্ছিলেন। তিনি কালু, মান্তু, হেবোদের উদ্দেশ্যে বললেন — মাথার চুলে তো তোমাদের পাক ধরেছে, বয়সও কম হ'ল না, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যেরকম চ্যাংড়ামি করতে এখনও সে অভ্যাসটা বদলাতে পারোনি। যাও না, রকে বসে আড্ডা না দিয়ে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের নাম জপ কর, ধর্মকথা শোন।

হেবো বলল — আপনি হক্ কথা কইছেন — মানে কথা-সবই তাঁর ইচ্ছে।

শেষ প্রশ্ন

সুলতা-সিদ্ধেশ্বর রায়ের বাড়িতে ছোট থেকে আশ্রিতা। জন্মসূত্রে নামগোত্রহীন, সরকারি হাসপাতালের সীমানার বাইরে আস্তাকুঁড়ের পাশে ন্যাকড়া জড়ানো অবস্থায় পড়েছিল। সঙ্গী ছিল রুগীদের হাত-পায়ের খোলা প্লাস্টারের টুকরো, অসংখ্য ছুঁচ, পচা, গলা ক্যান্টিনের খাবার, আনাজের খোসা ও পূতিগন্ধময় নোংরা কাপড় চোপড়, রক্তমাখা ন্যাপ্‌কিন্, ন্যাকড়া, ব্যাণ্ডেজের পাহাড়, স্যালাইনের খালি বোতল, ওষুধের খালি শিশি ইত্যাদি। চারপাশে গাড়ির আওয়াজ। তার ছোট্ট গলার চিৎকার সামনের রাস্তা দিয়ে চলমান জনতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। একটি নেড়ি কুকুর তার ছানাপোনা নিয়ে সেখানে বসে ছিল। ছোট্ট জ্যান্ত দেহটা দেখে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল। তার ছানাপোনারাও মা'র দেখে যথাসম্ভব চিৎকার করতে লাগল। নেড়ি কুকুর হলেও সে তো মা। ফলে পথচলতি মানুষের চোখে পড়ল। ডিউটি ফেরৎ সাহানা দেবী হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ঐ ভিড় দেখে এগিয়ে গেলেন।

—— কি ব্যপার। এতো ভীড় কিসের ?

—— দেখুন না, একটা বাচ্চাকে কারা ন্যাকড়া জড়িয়ে ফেলে গেছে। বেঁচে আছে কিনা কে জানে। যদি ঘরে রাখতেই না পারবি তবে জন্ম দিলি কেন ? যত সব পাপ। পৃথিবীটা রসাতলে গেল বলে জনতার মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল।

সাহানা দেবী বললেন —— আমি নার্স, আপনারা সরে যান, দেখি বাচ্চাটা বেঁচে আছে কিনা ? সাহানা দেবী বাচ্চাকে আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হাসপাতালের ভিতরে চলে গেলেন।

হাসপাতালের নার্সদের পরিচর্যায় বাচ্চাটি বড় হ'ল। পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে হাসপাতালের সুপার, অন্যান্য ডাক্তার ও নার্সরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন - সাহানাদেবী যদি রাজী থাকেন তাহলে তাঁর হাতেই এই বাচ্চাটিকে তুলে দেওয়া হবে। সবাই মিলে বাচ্চাটির নামকরণ করল সুলতা। সাহানাদেবী আনন্দে আত্মহারা। সুলতার জন্য ভাল জামা-প্যান্ট, খেলনা কিনে তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। সিদ্ধেশ্বরবাবু তো সাহানাদেবীর কাণ্ড অবাক হয়ে দেখছেন। তিনিও মনে মনে খুশী হয়েছেন-এতদিন বাদে বাড়িতে যেন চাঁদের হাট বসেছে।

সুলতা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। ওরা কোলকাতার কাছেই আন্দুলে থাকে।

পঞ্চায়েত এলাকা। কিন্তু কোলকাতার সঙ্গে সরাসরি বাসের যোগাযোগ আছে। ট্রেনে হাওড়া যেতে লাগে বিশ মিনিট, বাসে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যোগযোগ ব্যবস্থা ভালো। সুলতা মাধ্যমিক পাশ করল। ঐখানেই প্রভু জগদ্‌বন্ধু কলেজে এগারো ক্লাসে ভর্ত্তি হল। কো-এডুকেশন কলেজ। ঐখানে পড়ার সুবাদে অশনি পল্লে নামে একটি ছেলের সঙ্গে তার আলাপ পরে প্রেমে পরিণত হল।

সুলতাদের অবস্থা স্বচ্ছল। সিদ্ধেশ্বরবাবু বাউড়িয়া কটন মিল থেকে কিছুদিন হ'লো অবসর গ্রহণ করেছেন। সাহানাদেবী ডিউটিতে গেলে সিদ্ধেশ্বরবাবুর দেখাশোনা সুলতাই করে। পড়াশোনার ফাঁকে মায়ের জন্য সকালে রান্না, টিফিন সুলতা নিজেই করে। সাহানাদেবীও খুব খুশী। আর কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে যেন নিজের মেয়ের চেয়েও তাঁদের যত্ন-আত্তি বেশী করে। সংসারের কোন অভাব বুঝতে দেয়না। আর দু-তিন বছর পরে তিনিও অবসরগ্রহণ করবেন। তারপর সুলতা গ্রাজুয়েট হলে তার ভালো ঘরে বিয়ে দেবেন। নাতি-নাতনি নিয়ে অবসর জীবন ভালোই কাটবে।

ইত্যবসরে সুলতা অশনির অবৈধ প্রেমের ফলস্বরূপ ঘরে বমি করতে শুরু করেছে। রবিবার ছুটি থাকার ফলে সাহানাদেবী বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝে, সুলতা সুস্থ হলে তাব প্রস্রাব পরীক্ষার পর নিশ্চিত হয়ে সুলতাকে বললেন — তোকে ছোট থেকে ভালো করে মানুষ করার ফল এই হোল। তুই আমাদের মান-মর্যাদা মাটিতে মিশিয়ে দিলি। কে তোর এই সর্বনাশ কবল?

সুলতা বলে — মা আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ?

— তুমি কিছু বোঝনা। ন্যাকা। খবরদার বলছি আমার সঙ্গে ন্যাকামি করবি না। ঠিক্ করে বল কে তোর এই সর্বনাশ করল? কার সঙ্গে তোর ভালবাসা জমে উঠেছে? আমাকে এতদিন তো তুই কিছুই বলিস্ নি। সাহানাদেবী খুবই উত্তেজিত হয়ে একথা বলছেন আর কপাল চাপড়চ্ছেন। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে সুলতা দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ মাটির দিকে নামানো। চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। কোন উত্তর দিতে পারছে না।

সুলতাদেবী ধৈর্য হারিয়ে সুলতার গালে সজোরে একটা চড় মারলেন — কে এই সর্বনাশ করল? না হলে এক্ষুণি বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। কোনদিন তোর মুখদর্শন করতে চাইনা।

সুলতা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট স্বরে বলল — অশনি। অশনি পল্লে। সাহানাদেবী

বললেন — সে কে ? তাকে তো চিনিনা। তার নামও কোনদিন শুনিনি। তার সঙ্গে তোর ভাব কি করে হল ?

— সে আমার সঙ্গে কলেজে পড়ে। মাশিলায় বাড়ি। অবস্থা ভাল নয়।

— তোর সঙ্গে এই সম্পর্ক কি করে হোল ?

— তুমি ডিউটি গেছলে আর বাবা পেনশন আনতে ব্যাঙ্কে গেছলে। আমি একাই বাড়ি ছিলাম। ও এলো একজন প্রফেসরের একটা নোট দিতে। ভদ্রতার খাতিরে তাকে ঘরে বসিয়ে এক কাপ চা খাওয়ালাম। বাড়িতে কেউ নেই দেখে সে হঠাৎ জোর করে আমার এই সর্বনাশ করলো। আমি তাকে প্রাণপনে অনেক বাধা দিয়েছিলুম কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারিনি। ভয়ে তোমাকে কিছু বলতেও পারিনি। তুমি বিশ্বাস কর আমার কোন দোষ নেই। সাহানাদেবী আর স্থির থাকতে না পেরে বললেন — তাই বলি-আম গাছে আম হয়, আমড়া গাছে আমড়া। আমড়া গাছে যতই ভাল সার দাও না কেন, আমড়াই ফলবে। আম ফলবে না। তোকে যখন হাসপাতালের সামনের আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করলুম, ভাবলুম, তুই ভালো পরিবেশে মানুষ হবি। কিন্তু তুই তো জারজ সন্তান, বাবা মার ঠিক নেই। তুই তোর কাজ ঠিকই করেছিস। আমারই মস্ত ভুল, তোকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করা। যাক্ যা ভাল বুঝেছিস, করেছিস। এখন আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

সুলতা সকলের অজান্তে বিষণ্ণ-ভগ্নহৃদয়ে, ধীর পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। কোনো কথার প্রতিবাদ করলো না। ক্ষণিকের ভুলে তার বিরাট সর্বনাশ হয়ে গেল। সুলতা আন্‌মনে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে আন্দুল স্টেশনে গিয়ে লাইনের পাশ দিয়ে মৌড়িগ্রাম স্টেশনের দিকে চলতে লাগল। ও ভাবছিল — পালিতা মায়ের কাছে বড় না হয়ে ও যদি ওর গর্ভধাবিণী মায়ের কাছে বড় হ'ত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ওর ঐ হঠাৎ ভুলের জন্য ওকে এতবড় শাস্তি দিতেন না। তাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতেন। মার বুকে মুখটা লুকিয়ে একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করত। তবে মানুষ ভাবে এক — হয় আর এক। এই বয়সে এতটা মানসিক চাপ ওর সহ্যের বাইরে। অভুক্ত ক্লান্ত শরীরে সে আর হাঁটতে পারছে না। আপ লাইনে মেল ট্রেন আসছে, বিকট জোরে হর্ণ বাজিয়ে। সুলতার কানে কিছুই ঢুকছে না। সে ধীরে ধীরে আপ লাইনে শুয়ে পড়ল। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু প্রশ্ন করল — যদি স্বীকৃতিই না দেবে তবে জন্ম দিয়েছিলে কেন ? মেল ট্রেনের ধাক্কায় ওর দেহটা কয়েকটা মাংসের পিণ্ড হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওর শেষ প্রশ্নের উত্তর আর কোনদিনই সে পাবে না।

সংস্কার

সীমন্তি আর সৃজিকা ছোটবেলার বন্ধু। এখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর নিয়ে পাশ করে একই কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়ছে। সীমন্তি খুব লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। দেখতে শুনতেও ভাল। ওদেব নতুন বন্ধু হয়েছে কৃষ্ণা। সে একটু ডানপিটে গোছের। তাব দুই দাদা আছে। দাদাদের সঙ্গে থেকে থেকে তার হাবভাব, চলন বলন ছেলেদের মত। গলা ছেড়ে গান গায়, আড্ডা মারে, হৈ হৈ করে। ফুটবল, ক্রিকেট খেলারও খুব ভক্ত। অন্য মেয়ে বন্ধুদের মত লিপস্টিক, সেন্ট বা দুলের গল্প করে না, নতুন ধরনের কি স্কার্ট বাজারে বেরোলো তার গল্পতেও কৃষ্ণার কোন আগ্রহ নেই। তবুও সে সীমন্তি আর সৃজিতার বন্ধু। বি.এস.সি. প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পরীক্ষায় দ্বিতীয় দিনে পবীক্ষার পরে যখন কলেজের গেট থেকে ছাত্রীরা সবাই যে যার বাড়ির দিকে বেরোচ্ছে এমন সময় সীমন্তির ডান দিকেব কাঁধে একটা হালকা চাপড় মেরে কৃষ্ণা বলল —

— খুব তো একমনে লিখে গেলি। পরীক্ষা নিশ্চয ভাল হয়েছে ?

— খুব ভালো বলা যাবে না, তবে কোন প্রশ্ন ছাড়িনি। সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি।

সৃজিতা বলল — জানিস কৃষ্ণা, ছোটবেলা থেকেই ও ওইরকম বলে অথচ রেজাল্ট বেরোলে দেখা যায় বেশ ভাল নম্বর পেয়েছে।

সীমন্তি লজ্জায় মুখটা নামিয়ে নিল।

কৃষ্ণা বলল — যা ভাল করে বাড়ি গিয়ে পড়গে যা। কাল দেখা হবে। আমি ইণ্ডিয়া সাউথ আফ্রিকার ওয়ানডে ম্যাচটা তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখি। এই পরীক্ষার ঠ্যালায় ভাল করে খেলাটা দেখা হলো না।

সীমন্তি সন্ধ্যেবেলায় টেবিলে পড়তে বসেই হঠাৎ উঠে পড়ল। ওর মা বললেন — কিরে হঠাৎ উঠে পড়লি ? তোর চোখ ছলছল করছে। কি হয়েছে ?

সীমন্তি কোন কথা বলছে না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ফোঁট ফোঁটা জল ওর ফর্সা গাল বেয়ে নামছে। ওর মা আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন — কি হয়েছে ? কাঁদ ছিস কেন ? আজ পরীক্ষা কি ভাল হয়নি ?

— না, তা নয়।

— তবে, পড়া ছেড়ে এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস। আমাকে বললে কোন ক্ষতি হবে

না। কি হয়েছে?

— তুমি সত্যি বলছ — তোমাকে বললে ক্ষতি হবে না।

— মাকে বললে ক্ষতি হবে না, সত্যি সত্যি সত্যি। এই তিন সত্যি বললাম।

— নাঃ তোমাকে বলতে পারছি না। কষ্ট হচ্ছে।

— দূর বোকা মেয়ে, ফিজিক্স অনার্স পড়ছিস আর বাচ্ছা মেয়ের মত কাঁদছিস। বল — কি হয়েছে?

— অনেক দিন আগে সৃজিতা আমায় বলেছিল এক কাঁধে কেউ হাত দিলে তাকে অন্য কাঁধে হাত দিতে হয় নইলে যার কাঁধে হাত দিয়েছে তার মা মরে যায়।

— দূর বোকা, ও সব বাজে কুসংস্কার। ওকে প্রশ্রয় দিতে নেই। লোভ, হিংসা, ক্ষিদে, অলসতা আর কুসংস্কার যত প্রশ্রয় দিবি ততই তোর ঘাড়ে চেপে বসবে। মাথা খারাপ করে দেবে। তা হঠাৎ কাঁধে হাত দেওয়ার কথা মাথায় এলো কেন? কালকে পরীক্ষা। আজ পড়তে বসেই উঠে পড়ে এই সব আবোল তাবোল ভাবছিস্।

— আসলে আজ পরীক্ষার পরে যখন বাড়ি আসব বলে কলেজের গেট থেকে বেরিয়েছি হঠাৎ কৃষ্ণা আমার ডান দিকের কাঁধে হাত দিয়েছিলো। সেই কথাটা পড়তে বসেই মনে পড়ে গেল। কি হবে মা এখন। ও যতক্ষণ না আমার বাঁ কাঁধে হাত দিচ্ছে ততক্ষণ পড়ায় মন বসবে না। তুমি আমাকে কৃষ্ণার বাড়ি নিয়ে চলো।

— কৃষ্ণার বাড়ি কোথায়?

— আমি জানি না, সৃজিতা জানে।

— তাহলে ওকে ফোন করে কৃষ্ণার ফোন নম্বর জেনে নে।

— ঠিক আছে। সেই ভালো।

একটু পরে সীমন্তি ওর মাকে বলল — সৃজিতা ফোন করতে ও জানালো — কৃষ্ণার বাড়িতে ফোন নেই। ওর বাড়ি কলেজের কাছেই ৭ নং এম.জি.রোড।

— তাহলে তোর বাবা অফিস থেকে আসুক। তারপর না হয় তোকে নিয়ে যাবে। এখন মন খারাপ না করে পড়তে বোস।

রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ ডোর বেলটা বেজে উঠতেই শশঙ্ক বাবু দরজা খুলে দেখেন, অচেনা এক ভদ্রলোক ও একটি মেয়ে।

— কাকে চাই! আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

— কৃষ্ণাকে একটু ডেকে দিন। ও আমার সঙ্গেই কলেজে পড়ে।

— এত রাতে ওর সঙ্গে কি দরকার ? কাল পরীক্ষা । ওতো এই মাত্র পড়তে বসেছে । যা বলার আমাকে বল ।
— না কাকু, ওর সঙ্গে ভীষণ জরুরী দরকার ।
কৃষ্ণার বাবা বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণাকে ডাকতে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন, ওদের ঘরে বসানোর ভদ্রতাটুকুও করলেন না ।
কৃষ্ণা এত রাতে সীমন্তিকে দেখে খুব অবাক হয়ে বলল — এত রাত্তিরে তুই ? কি হয়েছে ?
— সেটা চেঁচিয়ে বলা যাবে না । কাছে আয় ।
— এবার বল কি এমন ঘটনা যার জন্যে তুই এসেছিস ?
সলজ্জভাবে সীমন্তি বলল — কলেজ থেকে বেরোনোর সময় তুই আমার ডান দিকের কাঁধে হাত দিয়েছিলি মনে আছে ?
না মনে নেই তবে তার জন্যে এত রাত্তিরে তুই এলি পড়াশোনা ছেড়ে ।
— না ভাই কিছুতেই পড়ায় মন বসছে না । একবাবটি আমার বাঁ কাঁধটা ধর । তাহলেই শান্তি ।
— আচ্ছা বাবা, তোর বাঁ কাঁধটাই ধরছি । ডান দিকের কাঁধ তো ধরা যাবে না । এবার খুশি তো ।
— খুব খুশি হয়েছি তার সঙ্গে শান্তিও পেলাম । এইবার বাড়ি গিয়ে মন দিয়ে পড়তে পারব । সন্ধ্যেবেলার তিনঘন্টা পড়া নষ্ট হল । তোরও অসুবিধা করলাম ।
কৃষ্ণা ভাবতে লাগল, কিন্তু সীমন্তির এই কাঁধ ধরার ব্যাপারটা বুঝতে পারল না । শেষকালে হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল — অল বোগাস্ যত্তসব মেয়েলি ব্যাপার ।

রম্য রচনা

ঠকাস্

সব মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। এরকম অবাক করা একটা ঘটনার গল্প আপনাদের জানাতে চাই। আপনাদের জানাতে পারলে মনটা একটু হাল্কা হয়। মনের কথা গুছিয়ে বলতে পাবি না বলে, সামান্য কথায় মনের ভাব একটু লিখে জানাবার চেষ্টা করছি মাত্র। লেখাটা ভাল হ'ল, কি হ'ল না সেটা বড় ব্যাপার নয়। আসল কথা আমার মনের কথাব বোঝাটা একটু হাল্কা হলে রাত্তিবে একটু ঘুমোতে পারি, এই আব কি! অনেক আজেবাজে কথা বললাম। এইবাব কাজেব কথায় আসি।

আমি একটি সরকারি অফিসে চাকরি করি। অবসর নিতে আর দু'তিন বছর বাকী। আমার বাড়ি থেকে কর্মস্থল, বাসে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। একদিন বিকাল পাঁচটায় অফিস ছুটির পরে দৌড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা প্রাইভেট বাসের পিছন দবজা দিয়ে উঠে ডান পাশে ছ'জনেব বসার সিটেব একটা জায়গা ফাঁকা ছিল বলে বসে পড়লাম। পেছনের দরজায় কাণ্ডকটর দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশের পাঁচজনের বসার লেডিস সীটের প্রথমেই — একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের মেয়ে, নীল আব সাদা বড় বড় ফুলের ছাপ দেওয়া সালোয়ার কামিজ পরে বসে আছে। দেখে মনে হয়, সদ্য বিউটি পার্লার থেকে কায়দা করে চুল বেঁধে মুখে ফেসিয়াল করে এসেছে। চেহারাটা ছিপছিপে, লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, মুখশ্রী সুন্দর। তারমধ্যে চোখ দু'টো খুব বড় বড় আর টানা টানা — যাকে উনিশ শতকেব সাহিত্যে পটলচেরা চোখ বলা হত এবং বিশ শতকের সাহিত্যে — জীবনানন্দ দাসের বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন'-এ ঐ চোখের বর্ণনা আছে— 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'। যাইহোক আমি তো লেখক নই, সেইজন্য মনের আবেগে আবোল-তাবোল কতগুলো কথা লিখে আপনাদেব অমূল্য সময়েব অপচয় করছি। তো সেই মেয়েটাব দিকে চোখ পড়তেই সে আমার দিকে মুচকি হাসল। কিছুক্ষণ পর আবার তার দিকে চোখ পডতেই সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমার খুব লজ্জা করছে, কিন্তু একটা অদম্য কৌতুহলও মাথায় চেপে বসেছে। আমি ভাবছি এই একবিংশ শতকের গোড়ায় চারিদিকে খুব গোলমেলে অবস্থা। মেয়েটা, আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বয়সে ছোট, সদা কৈশোর থেকে যৌবনে পড়েছে কিন্তু আমি প্রৌঢ়, দু'তিন বছর পরেই কর্মস্থল থেকে অবসর নেবো। তা আমাকে দেখে ঐ চোখের তীর্যক চাউনি, মুচকি হাসি,

শুধু একবার নয় বারবার। কি রহস্য ? জানতে ইচ্ছে করছে। আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে না তো ? আজকাল খবরের কাগজে পড়ছি ঐ বয়সের মেয়েরা টাকা রোজগারের জন্য অসৎপথে নেমে পড়ছে। শেষে বুড়ো বয়সে ছেলে-ছোকরাদের হাতে গণধোলাই খাব নাকি ? আর বাড়িতে যদি আমার গিন্নির কানে খবরটা যায়, তাহলে তার বাতের জন্য কোমরের ব্যাথা, হাঁটুর ব্যাথা বেলামুল উবে যাবে। ঐ অবস্থায় কোমর ব্যাঁকাতে ব্যাঁকাতে রান্নাঘরে ছুটবে মুড়ো ঝাঁটা আনার জন্য আর আমার সাবা দেহে তার প্রয়োগ হবে। ঐ কথা ভেবে বাসের মধ্যেই ভয়ে আধমরা, আঁতকে উঠি। আমার চম্‌কে ওঠা দেখে মেয়েটা আরও খিলখিল করে হেসে ওঠে। এবারে আর মুচ্‌কি হাসি নয়, এক্কেবারে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। আমার খুব রাগ হচ্ছে-মনে হচ্ছে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলীর মত সজোরে ডান-হাতের একটা ঘুঁষি ওব চোয়ালে লাগাই যাতে এক্ষুণি ওর সব দাঁতকটা খসে পড়ে যায়। হাসি তখন বেরিয়ে যাবে। আমার মত বুড়োকে দেখে হাসার মজাটা ভালোভাবে পেয়ে যাবে। মনে মনে ঠিক করলাম — নাঃ, ওর দিকে আর কিছুতেই তাকাবো না। কখনো না। কিছুতেই না। কিন্তু মন চাইলেই তো হ'ল না, চোখ বিদ্রোহ করে বস্‌ল। কিছুতেই তাকে বাগ মানানো গেল না।

এখনকার যুগ, বিদ্রোহের যুগ, বিপ্লবের যুগ। নেতাবা যতই মাইকে চিৎকার করুক না কেন সত্যিকারের বিপ্লব এদেশে কোনদিনই হবে না কারণ, ধান্দাবাজ যেখানে শতকরা নিরানব্বই শতাংশ, সেখানে দেশের জনগণ আর যাই করুক না কেন, বিপ্লব ঘটাতে পাববে না। কারণ সেখানেই তারা হিস্যার ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুন-খাবাপি করবে।

আবার বাজে কথায় চলে গেছি, কেজো কথা ছেড়ে। বুড়ো বয়সে এই এক রোগ। এইসব নানা ঘটনা ঘটার ফাঁকে আমার নামবার জায়গা এসে গেল। মনটা বল্‌ল — যাক, শেষ দেখা দেখে নি, আর হয়তো কোনদিনই দেখা হবে না। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে 'জয়-মা' বলে শেষ দেখার জন্য যেই তাকিয়েছি-ও চোখের চাউনিটা একটু ছোট করে মিষ্টি হেসে ডান-হাতটা অল্প নাড়তে নাড়তে টা-টা-বাই জানাল। মনটা উথাল-পাতাল করে উঠল। আমি বিস্ময়ে হতবাক, স্তব্ধ। কণ্ডাক্টর আমার পেটে একটা সজোরে ডানহাতের খোঁচা মেরে খিঁচিয়ে উঠল — অনেকক্ষণ তো স্টপেজে বাস দাঁড়িয়েছে, না নেমে হাঁ করে ভ্যাবলার মত কি ভাবছেন ? নাম্‌তে না ইচ্ছে করলে সরে দাঁড়ান, আপনার পিছনে দাঁড়ানো লোকেদের নামতে দিন। এই ভ্যাপসা গরমে লোকে পচ্‌ছে আর উনি বাসের গেটে দাঁড়িয়ে

দ্যায়লা করছেন। 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি'— পেছন থেকে একজন যাত্রীর কর্কশ আওয়াজ ভেসে এলো। আর একজন বল্‌ল — দাদা বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়েছে — দেখছেন না, কি রকমভাবে তাকাচ্ছিল একটি মেয়ের দিকে। অন্য একজন টিপ্পনি কাটলো, আপনার মেয়ের চেয়েও তো ছোট মশাই — লজ্জা করে না ঐ ভাবে বারবার তাকাতে ? আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। একটু আগেই যা ভাবছিলাম — গণধোলাই খাওয়ার কথা, তাই বোধহয় কপালে জুটলো। এই বুড়ো বয়সে ধোলাই খেলে আর বাঁচবো না, পুরো চাকরীটাও আর করা হবে না। সব্বেনাশের মাথায় পা। তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে বাস থেকে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ি। বাড়ির দরজায় জোরে জোরে কলিং বেলটা বাজাচ্ছি, তর সইছে না। ভয় হচ্ছে, বাস থেকে নামার সময়েব লোকগুলো পেছনে তাড়া করে আস্‌বে না তো ? কি জানি, আর তর-সইছে না। দরজাটা খুললে বাঁচি। বাড়িতে গিন্নি ছাড়া আর কেউ নেই। সে বাতেব ব্যাথায় কোঁকাতে কোঁকাতে দরজা খুলতে আসছে। মনে পড়ল আজ আবার একাদশী। বাতের ব্যাথাটা খুবই বেড়ে গেছে বোধহয়। তাঁর কাতর কোঁকানির — "উফ্, আঃ, বাবারে, গেছিরে, আর পারিনা, মরলে বাঁচি, এই কষ্ট আর সহ্য হচ্ছে না-ভগবান কবে মুখ তুলে চাইবেন সেই ভরসায় আছি," আওয়াজ পাচ্ছি। ঘর থেকে সদর দবজা একটুখানি রাস্তা। আধ মিনিটেব রাস্তাটা মনে হচ্ছে আধঘন্টা লাগছে। বুকটা ভয়ে তোলপাড় করছে। আর সহ্য করতে পারছি না। এখুনি স্ট্রোক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগেই বোধহয় গণধোলাই খেয়ে মবে যাব। নিজের পাড়ায় গণধোলাই খেলে লজ্জার একশেষ। বউ মেয়ে লজ্জায় পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবে না। ছিঃ, ছিঃ এ আমি কি কবলাম। খুবই আফশোস হচ্ছে।

দরজাটা অবশেষে খুল্‌ল। কোনরকমে দরজাটা বন্ধ করেই হাত-মুখ না ধুয়েই বসার ঘরে ঢুকে টিভির সুইচটা চালিয়ে দিয়ে সোফায় ঝপাং করে বসে পড়ে, টেবিল থেকে এক লিটারের জলের বোতলটা নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে এক নিঃশ্বাসে বোতলটা শেষ করলাম। বুক ধড়ফড়ানিটা একটু কমেছে। ফুল স্পীডে সিলিং ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে এবাব আয়াস করে সোফায় বসে রিমোটটা হাতে নিয়ে চ্যানেল ঘোরাতেই দেখি-এখানেই বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এই চ্যানেলে একটা গানের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আর গানটা গাইছে সেই বাসে দেখা মেয়েটি। চোখটি টিভির পর্দায় আটকে গেল যেন 'ফেবিকল-আঠায়'। কি দেখছি, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। স্বপ্ন দেখছি না তো ? দু'বাব হাত দিয়ে চোখ কচ্‌লে নিয়ে দেখি, ঠিকই দেখছি। দিবাস্বপ্ন দেখছি না। কিন্তু এও কি সম্ভব ?

বাসের ঐ মেয়েটা সেই নীল আর সাদা ফুল ফুল ছাপ দেওয়া সালোয়ার-কামিজটা পরে মাউথপিস্‌টা হাতে নিয়ে ঘুরেফিরে গান গাইছে। আর আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমার দিকে তীর্যক চাউনিতে চাইছে আর মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। ঐ চোখের তীর আমার বুকে সেল হানছে। কমবয়সে ওটা হয়তো সহ্য করা যেত। বুড়ো বয়সে আর পারছি না। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি — ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না। বুকটায় ধড়ফড়ানি বেশ বেড়ে গেল। সারা শরীরে রক্তের চাপও বাড়ছে। শিরা-উপশিরা-ধমনীর মধ্যে দিয়ে রক্তের স্রোত দৌড়ে বেড়াচ্ছে। আর পারছি না। আমার গিন্নি কোঁকায় বাতের ব্যাথায়, আমি কোঁকাই বুকের ব্যাথায়। অসহ্য! হঠাৎ গিন্নির ধমকে চম্‌কে উঠি। কি অমন হাঁ করে টিভিতে মেয়েটাকে দেখছ? তুমি বাচ্চা মেয়েটাকে দেখছ না গিলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার কি বুড়ো বয়সে ভীমরতি ঘটল যে চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না?

না গিন্নি তা নয়। চোখের মনিতে বাত ধরেছে। সে তোমায় বোঝাতে পারবো না। তুমি তো আর চোখের ডাক্তাব নও। তুমি আর কি বুঝবে? তোমাকে ধরেছে হাঁটুতে, আমাকে ধরেছে চোখে। সেইজন্যেই চোখেব পাতাও পড়ছে না, চোখের মণিও নড়ছে না।

ছোটবেলায় গুলি (মার্বেল) খেলতে খেলতে আমরা বন্ধুরা বলতাম — নট্‌ নড়ন-চড়ন, বাট ঠকাস্‌। গিন্নি আমার হাত থেকে রিমোটটা ছিনিয়ে নিল। মাথায় জোরে রিমোটটা দিয়ে ঠুকে দিয়ে বল্‌ল — কি আওয়াজটা বেরোল বলতো? যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে- রাগও হচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। কোনরকমে কেঁদে-কঁকিয়ে গিন্নিকে বল্‌লাম — ঠকাস্‌।

গিন্নি বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। এ ঠকাস্‌ তোমার ছেলেবেলাব গুলিখেলার ঠকাস্‌ নয়। মনে থাকে যেন, কোনরকম বেচাল দেখলে এবার আর পার পাবে না। নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে। এমন শিক্ষা দোব যে ওপরে গেলেও মনে থাকবে জন্মজন্মান্তরের জন্য।

ভাবলাম, ন্যাড়া কী আর সাধে বেলতলায় কখনও যায়?

দাঁত-সমাচার

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে হায়দ্রাবাদে সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে আমার খুব দাঁতের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। ডানদিকের কষের উপরের পাটির একটা দাঁত ক'দিন ধরেই ভোগাচ্ছিল। বাড়িতে দাঁতের যন্ত্রণা হ'লে লবঙ্গ তেল-এ তুলো ভিজিয়ে দাঁতে চেপে ধরলে কমে যেত বলে এদিকে বিশেষ নজর দিইনি। বেড়ানোর নেশায় হায়দ্রাবাদ চলে গেছি কিন্তু তাড়াতাড়িতে লবঙ্গ তেল ব্যাগে নিতে ভুলে গেছি বলে ট্রেনের মধ্যে এই বিপত্তি। আসল ব্যাপারটা হ'ল — গতকাল ট্রেনে চাপার আগে হায়দ্রাবাদ স্টেশনের কাছে বিরিয়ানীর জন্য বিখ্যাত একটা হোটেলে মনের সাধ মিটিয়ে মাটন বিরিয়ানী খেয়েছি কিন্তু তার জন্য এত কষ্টে পড়ব কে জানত। একটা মাংসের কুঁচি সেই ফুটো দাঁতটার মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গেঁড়ে বসে গ্যাছে, যেন ব্যাঙ্কের ফিকস্ ডিপোজিট-সময় না হলে বার হবে না। রাত্রি আটটা নাগাদ খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন থামতেই স্যুটকেশ, ফ্লাস্ক, জলের জায়গা নিয়ে ইশারায় গিন্নিকে হাত পা নেড়ে বোঝালাম — এখুনি, এই স্টেশনেই নামতে হবে। গিন্নি অবাক হয়ে আমাকে বলল — আমরা তো হাওড়ায় নামব, হঠাৎ এখানে কি ব্যাপার ? আমি ইশারায় বোঝালাম-দাঁতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে-এখানেই নামব।

স্টেশনে নেমে গিন্নি বলল — এত রাত্তিরে এখানে নামলে-কোন চেনাশোনা নেই অচেনা জায়গা, খুব ভয় লাগছে। কাগজে পড়েছি, খুন-ছিনতাই এখানে সবসময় হচ্ছে। আমি আশ্বস্ত করে বললাম — কলাইকুণ্ডায় বায়ুসেনা শিবিরে আমার ভাগ্নে থাকে। সে খুব বড় অফিসার। তার কাছেই যাব। সেও অনেকদিন পরে আমাকে দেখতে পেয়ে খুশিই হবে।

স্টেশন মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম — এখানে তো রাত্রিতে খুব গোলমেলে জায়গা, কিভাবে কলাইকুণ্ডা যাব বলুন তো ? খুব বিপদে পড়ে এখানে নামতে বাধ্য হয়েছি। দাঁতের ব্যাথার যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, তবুও কষ্ট করে বলতে বাধ্য হলাম। স্টেশন মাষ্টারমশাইয়ের দয়া হ'ল। তিনি তাঁর চেনা একটি ট্যাক্সিকে ডেকে পাঠিয়ে আমাকে বললেন — আপনি ঠিকই বলেছেন এটা খুবই গোলমেলে জায়গা বিশেষতঃ রাত্রি আটটার পর। আমার চেনা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি বললাম-ভাড়া কত নেবে ? উনি বললেন আশী টাকা মত নেবে। রাস্তাঘাট খানা খন্দে ভর্ত্তি। সেইজন্য রেটটা একটু বেশী পড়ছে। আমি রাজী। যদি ট্যাক্সি ড্রাইভার একশো টাকাও চাইত তাও দিতে কসুর করতাম না।

আমার এখন তাড়াতাড়ি ভাগ্নে বাড়ি গিয়ে দাঁত থেকে মাংসের টুকরোটা বার করার খুব প্রয়োজন।

ট্যাক্সিতে আসতে আসতে গিন্নি বললো — হ্যাঁগো, এয়ারফোর্স স্টেশন তো অতবড় জায়গা। কি করে তোমার ভাগ্নের কোয়াটার্সর খুঁজে পাবে ? আমি বলি — ও খুব উঁচু পদে আছে সেজন্য অসুবিধা হবে না। এয়ারফোর্স স্টেশনের গেটে এসে ট্যাক্সিটা থামতেই একজন সিপাই গোছের লোক বেরিয়ে এসে হিন্দীতে বলল — কাকে চাই ? আমি আমার ভাগ্নের নাম বললাম। সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেটের ভিতরে চলে গেল। খানিকবাদে গেটটা পুরো খুলে দিয়ে ট্যাক্সিটাকে ভেতরে ঢুকে দাঁড়াতে বলল। আবার বাইরের গেট বন্ধ হয়ে গেল। গেট থেকে যে সিপাইটা আমাদের গেটের মধ্যে আসতে বলল — সে ওখান থেকে ইন্টারকমে আমার ভাগ্নের কোয়ার্টারে ফোন করল। আমার নাম ও কোথা থেকে আসছি জানতে চাইল ঐ সেপাইটি। আমি বললাম। সে ভাগ্নেকে জানাল, তারপর আমাকে একটা স্যালুট ঠুকে বলল — স্যার, আপ জাইয়ে। আমি হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে বললাম — ও কোয়াটার্স নম্বর জানিনা। তখন সে একটা কাগজে কোয়ার্টার নম্বর লিখে ট্যাক্সিওয়ালাকে বুঝিয়ে দিল কিভাবে ঐ জায়গায় যেতে হবে। যাইহোক ভাগ্নের কোয়ার্টারের কাছে আসতেই দেখি কোয়ার্টারের সামনের লনে ভাগ্নে, ভাগ্নে বৌ আর তাদের চার বছরের ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নামতেই ওর কাছে যে আর্দালী কাজ করে সে আমাদের মালপত্র ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। ওরা দোতলায় থাকে। ওদের বাড়ীতে যে দু'জন কাজকর্ম করে তারা ঐ কোয়ার্টারের পিছন দিকে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারে থাকে।

ওদের ঘরে ঢুকে দেখি বিশাল বড় ড্রইংরুম, তিনটে বেডরুম, দু'টো বাথরুম টয়লেট সহ, একটা শুধু টয়লেট (ইংলিশ প্যাটার্ন) রান্নাঘর, স্টোর রুম। স্টোররুমের এক অংশে ভাগ্নেবৌ ঠাকুরের সিংহাসন রেখে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া একটা ছোট স্টাডিরুমও আছে। কোয়াটার্সের চারপাশে খোলা, খুব আলো হাওয়া আসে। আমি আর গিন্নি অবাক হয়ে চারদিক ঘুরে দেখলাম। ভাগ্নেরা খুব খুশি। ওরা বলল — মামা, আপনারা যে এরকম অসময়ে এসে পড়বেন ভাবতেই পারিনি। কতদিন আপনাদের আসতে বলেছি অথচ এতদিন পরে আপনাদের মনে পড়ল। আমার স্ত্রী বলল — জানোতো বাংলায় একটা কথা খুব চালু আছে — চাপ্ পড়লেই বাপ্। তাই তোমার মামার মত কুঁড়ে লোক যখন খড়্গপুর স্টেশনে তাড়াহুড়ো করে নামল, তখন বুঝেছি কিছু গোলমাল হয়েছে।

তোমার মামার ট্রেনের মধ্যে খুব দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেইজন্য এখানে এসেছে। এখন তাড়াতাড়ি একটু ঈশদুষ্ণ গরম জল ও একটা দাঁত খোঁচানোর কাঠি দাও তো মা। মামার দাঁতের ফাঁকে মাংসের টুকরো গতকাল থেকে অটকে আছে। সেটা বার করতে পারলে যদি তোমার মামার দাঁতের যন্ত্রণা একটু কমে।

হালকা গরম জলে কুলি করে টুথ্ পিক্ দিয়ে খানিকটা ঝামেলা করার পর বাবু বার হলেন। তারপর রাত্রি এগারটা অবধি এলাহী খাওয়াদাওয়া, গল্প হল। ভাগ্নেরা বললো — অন্ততঃপক্ষে এক সপ্তাহ এখানে থাকতেই হবে তার আগে আপনাদের ছাড়ছি না। ভাগ্নেবৌ বলল — মামা, কাল সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে তৈরী হয়ে নেবেন। আমি ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আপনাকে আমাদের হসপিটালে নিয়ে যাব। সেখানে ডাক্তার দত্ত বলে একজন খুব বড় দাঁতের ডাক্তার আছেন, তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে আসব। আমি একটু ভয়ে ভয়ে বললুম — আমি না হয় বাড়ি গিয়েই দেখাবো, অন্য জায়গায় ভয় লাগে। আমার গিন্নী বলল — না, তোমাকে বৌমার সঙ্গে গিযে দাঁত দেখাতে হবে। শেষকালে দাঁত না দেখিয়ে বাড়ি যাবার সময় ট্রেনে হাওড়া পৌঁছানোর আগেই যদি দাঁত বার করে উল্টে পড় তখন দেখবেটা কে শুনি ? প্রত্যেক স্টেশনেই তো আর তোমার ভাগ্নে নেই যে সেখানে সেবা করার লোক থাক্‌বে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে চেপে গেলাম। বুঝলাম গিন্নীর প্রেসারের পারদ চড়ছে-অতএব চুপ করে থাকাই মঙ্গল।

পরের দিন সকাল সাতটার মধ্যে তৈরী হয়ে নিলাম। ভাগ্নেবৌ তার ছেলেকে নিয়ে তৈরী। নীচে নেমে এসে ভাগ্নের মারুতী ৮০০ গাড়িটা বৌমা নিজেই চালিয়ে আনল। তাইতো আমি আর নাতি দু'জনে পিছনের সীটে বসেছি। দু'জন খুব গল্প করতে করতে যাচ্ছি। সে আমাকে ওখানকার বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে পরিচিত করাচ্ছে। দেখ দাদু, ঐ যে বড় লাল বাড়িটা-ওটা অফিসার্স ক্লাব। ওর পাশে লেডিস ক্লাব। তোমাকে একদিন আমি অফিসার্স ক্লাবে বেড়াতে নিয়ে আসব। অনেক দেখার জিনিষ আছে, ড্রিংসও পাওয়া যায়। আমি বলি দেখ দাদুভাই, আমি তো এয়ারফোর্সের লোক নই, আমি সিভিলিয়ান। ওরা আমাকে ঢুকতে দেবে কেন ?

আমি তোমাকে আমার গেস্ট করে নিয়ে যাব। কেউ আটাকাবে না। এইসব গল্প করতে করতে ওর স্কুল গেটের কাছে পৌঁছে গেলাম। ও নিজেই দরজা খুলে নেমে আমাদের টা টা ক'রে হাত নেড়ে স্কুলের গেটের ভিতর চলে গেল। আমি ভাবছি, ওদের বাবাদের মত এইটুকু ছেলেরাও স্মার্ট। কথাবার্তায় কোন জড়তা নেই।

এবপর আমার পালা। বৌমা আমাকে নিয়ে চলল-দাঁতের ডাক্তারের কাছে, ওদের হসপিটালে। হসপিটালের সামনে গাড়ি থেকে নেমে বৌমার সঙ্গে চললাম। ওই আমার পথপ্রদর্শক। একটা বড় দরজার মাথায় দেখি বোর্ড দেওয়া আছে-ডেন্টাল ক্লিনিক। পাশে বোর্ডে লেখা ডাঃ প্রবাল দত্ত, বি.ডি.এস. (ক্যাল) ....ইত্যাদি। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখি সোফায় একজন রুগী বসে আছেন। আর একজন ডাক্তারের চেম্বারে। তার মানে তিন নম্বরে আমি যাব।

বৌমাকে ফিস্‌ফিস্ করে বললাম-খুব ভয় করছে, তার চেয়ে বরং কোলকাতায় বাড়ি ফিরে ডাক্তার দেখাবো। বৌমা বলল - আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন। ওনার হাত খুব পাকা। দাঁত তুললে আপনি বুঝতেই পারবেন না। ব্যাথা যন্ত্রণা হওয়া তো দূরের কথা। উনি অনেক বছর বিদেশে কাটিয়ে তারপর আমাদের এয়ারফোর্সে যোগ দিয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের সহযোগী একজন ষণ্ডামার্কা ঝুলকালো মহিলা হেঁড়ে গলায় আমার নাম ধরে ডাকলেন। ঐ ডাক শুনলে পিলে চম্‌কে যাবে। এতক্ষণ ধরে বুকে ধুক পুকানি চলছিলো, এবার ঐ ডাকে হৃদপিণ্ডে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগলো। মনে হোল — বাপধন এবার শেষ!

এইসব ভাবছি-এমন সময় ডাক্তার গর্জে উঠলেন — এত দেরী করে আসলে বাকী রুগী দেখব কখন? নিন্, তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে পড়ুন। আমি কাতর চোখে বৌমা'র দিকে তাকাতেই ডাক্তাব বৌমাকে বললেন — আপনি বাইরে বসুন। প্রয়োজন হলে ডাকব। আমার নিজেকে তখন মহাভারতের অভিমন্যু মনে হচ্ছে। দু'জনের হাতেই অক্কা পাব। ডাক্তারের চেহারাটা বেশ পেটা, মাঝারী গড়ন, মুখটা আগেকার দিনের বগী থালার মত-তারমধ্যে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত পুরুষ্ট কাঁচাপাকা গোঁফ বেশ যত্ন করে ছাঁটা। চোখগুলি গুলি গুলি, ভাঁটার মত। কথা বললে মনে হয় চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। থাইরয়েডের রুগী কিনা কে জানে? বয়স আমার মতনই হবে, তবে এয়ারফোর্সে ভাল খাওয়াদাওয়ার মধ্যে আছে বলে চোখের গহনা এখনও পরতে হয়নি।

আমি তো বেড়াল ছানার মত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসলাম। মাথার ওপর বাজপাখি ডাক্তার আর চিলের মত তার সহকারী মহিলা। ডাক্তারবাবু সহকারীকে বললেন — মিস্ হেম্‌ব্রম্, ওনার ব্লাড প্রেসার আর ব্লাড সুগারটা মাপুন। তিনি আমার হাতে পট্টি বেঁধে প্রেসার দেখলেন, তারপর আঙুলের ডগায় ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বার করে ছোট্ট একটা মেশিনে ব্লাড সুগার মাপলেন। ডাক্তারবাবুকে একটা ছোট কাগজের স্লিপে রিপোর্ট লিখে

দিলেন। রিপোর্টটা দেখে ডাক্তারবাবু হুম্ বলে একটা বিকট আওয়াজ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর তাঁর সিট থেকে উঠে আমার মুখের সামনে একটা বড় আলো ফেলে বললেন — কোন্ দাঁতটায় প্রবলেম হচ্ছে? আমার মুখ দিয়ে ভয়ে কথা বেরোল না। কোনরকমে হাত দিয়ে দেখালাম। ডাক্তারবাবু একটা চামচে মত যন্ত্র দিয়ে দাঁতটায় আঘাত করতেই আমি সীট থেকে যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠলাম। ডাক্তারবাবু মিস্ হেম্‌ব্রম্‌কে বললেন — জোরসে রুগীর মাথাটা চেপে ধরুন। সে এ্যয়সা জোরে আমার মাথাটা চেয়ারের সঙ্গে চেপে ধরল, মনে হল-বেড়াল ইঁদুরছানা ধরেছে। ডাক্তারবাবু বললেন — কষের দাঁত, একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, তুলে ফেলতে হবে। আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তিনি মুখের মধ্যে টাগরায়, মাড়িতে চার-পাঁচটা ইঞ্জেকশন দিলেন মুখটা অসাড় করার জন্য। কিছুক্ষণ পর আমায় বললেন, মুখের ভিতরটা ভারী ভারী লাগছে? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। মনে মনে ভাবছি, আর দাঁত তুলে কাজ নেই, এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।

আমার মুখটা ডাক্তারবাবু জোরালো আলোতে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন — অনেকদিন ধরে খুঁজছি কিন্তু ব্যাটাকে এ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি। আর ছাড়ব না। একেবারে হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। আমার খপ্পর থেকে পালিয়ে যাওয়ার মজা এক্ষুণি টের পাওয়াচ্ছি। আমি ভাবছি, লোকটা পাগল নাকি? হঠাৎ এরকম ভুল বক্‌ছে। কি জানি বাবা, মিলিটারীর ব্যাপার, হয়ত সকালেই দু'বোতল চাপিয়ে এসেছে। আবার হুঙ্কার — মিস্ হেম্‌ব্রম্, বড় ছেনি, হাতুড়ি আর সাঁড়াশি দিন। তারপর রুগীর মুখটা চেপে ধরুন যাতে ব্যাটা নড়তে না পারে। আমার তো ভয়ে হার্ট ফেল করার যোগাড়।

আমি ভাবছি, লোকটা কীরকম অভদ্র। যেমন বনমানুষের মত দেখতে, তেমনি কথাবার্তা। কি করে বিদেশে অতদিন থাকলো। কে জানে? সভ্যতা, ভদ্রতা কিছুই শেখেনি। আমি তাকে চিনিনা, জানিনা আর আমাকেই হোঁতকা ডাক্তার 'ব্যাটা' বলে সম্বোধন করছে। আমার বেশ রাগ হয়ে গেল। শেষে ডাক্তারকে বললাম — আপনি আপনার সহকারীকে কি আমার কথা বলছেন? ডাক্তার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মোটা গোঁফ জোড়ার ফাঁক দিয়ে বললেন — তোকেই বলছি রে গাধা। আমার সামনের এই ভাঙা দাঁতটা দেখে বুঝতে পারছিস না, উজবুক কোথাকার। আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ ব্যাজার মুখে বসে রইলাম। "পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে" এখান থেকে পালাতে পারলে

বাঁচি। বৌমা আচ্ছা পাগল ডাক্তারের হাতে আমায় ফেলেছে।

যাইহোক, ডাক্তার পাগল হলে কি হবে, দাঁত তোলার হাতটা ভারী সুন্দর। বোঝাই গেল না, যে দাঁত তুলেছে। আমার সামনে একটা ট্রেতে দাঁতটা এনে দেখিয়ে বললেন — এত খারাপ অবস্থা হ'ল কি করে? ভাল মাজন দিয়ে দাঁত মাজিস না বোধহয়। চিরকাল নিম আর আশশ্যাওলা গাছের দাঁতন দিয়েই কিপ্‌টেপনা করে চালাচ্ছিস। ডাক্তার হাত ধুয়ে নিলেন। ওর সহকারীকে দিয়ে বৌমাকে ডেকে পাঠালেন। বৌমা আসতেই বললেন — একঘন্টা বাদে মুখ থেকে তুলোটা ফেলে একটা আইসক্রীম খাওয়াবেন। ঠাণ্ডা দুধ, সুজি আর লিকুইড খাওয়াবেন। আগামীকাল থেকে দিনে তিনবার সামান্য গরমজলে নুন ফেলে কুলি করতে হবে। ওষুধ লিখে দিয়েছি। আজ সোমবার, সামনের রোববার সকালে ঠিক দশটায় আমার কোয়ার্টারে 'ব্যাটা'কে নিয়ে আসবেন। সেলাইটা কেটে দেবো। ও 'ব্যাটা' ভয়ে হয়ত আসতে চাইবে না কিন্তু ধরে নিয়ে আসবেন। ডাক্তারবাবু আমাকে 'ব্যাটা' বলে সম্বোধন করছেন দেখে বৌমা রাগে অগ্নিশর্মা। বৌমা বলল — ডাক্তারবাবু, আপনি আমার মামাশ্বশুরকে 'ব্যাটা' বলছেন? আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। আমি এখুনি আপনার নামে হায়ার অথরিটির কাছে কমপ্লেন করবো। ছিঃ ছিঃ আপনি একজন বিলেতফেরত ডাক্তার হয়ে এত অভদ্র! আমি চিন্তাও করতে পারছি না। — শোন বৌমা, তুমি এই 'ব্যাটা'র যখন বৌমা, তখন আমারও বৌমা। তোমরা সকলে মিলে আমার বাড়ি রোববার সকালে ঠিক দশটায় আসবে। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চও খাব। তোমাদের অল্প বয়স, সামান্য কথাতে চটে যাও কেন? আজকে আমি দাঁতের ডাক্তার হয়েছি এই 'ব্যাটার' জন্য, নইলে, হয়ত অন্য কোন প্রফেশন নিতে হত। আমি অবাক হয়ে শুনছি। অল্প অল্প ভাসা ভাসা ডাক্তারের মুখটা এবার মনে পড়ছে।

কোলকাতার কাছে মফঃস্বল শহরে আমি স্কুলে পড়ি। যখন নাইনে পড়ি তখন একদিন স্কুল ছুটির একটু আগে, কিছু সহপাঠী বন্ধু আমাকে এসে বলল — প্রফুল্ল ডাক্তারের ছেলে প্রবাল, যে আমাদের সঙ্গে পড়েরে, ফার্স্ট বেঞ্চিতে বসে, তার খুব অহংকার, সে আমাদের মত সাধারণ ছেলেদের পাত্তাই দেয়না। ভাল রেজাল্ট করে বলে মাথা কিনে নিয়েছে। আমি বলি, প্রবাল অন্য স্কুলে থেকে সবে এখানে ভর্তি হয়েছে। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি বলে হয়ত এরকম মনে হচ্ছে। ও খুব ভাল আর ভদ্র ছেলে। আমার সঙ্গে তো ভাল করেই কথা বলে। বন্ধুরা বলল — তুই ক্লাসের ক্যাপ্টেন বলে তোর সঙ্গে কথা বলে। আমাদের কোন কথা শুনতে চায়না। আজ স্কুলের ছুটির পরে ওর ব্যবস্থা তোকে করতেই হবে।

প্রবাল একজন, আর এরা দলে পনেরোজন। এদের হিরো আমি, ফলে ওদের কথা রাখতেই হবে। স্কুল ছুটির পরে বাড়ি যাবার পথে অন্য বন্ধুগুলো গায়ে পড়ে প্রবালের সঙ্গে ঝগড়া বাধালো। আমাকে বলল মার্, মুখে ঘুঁসি মেরে মুখটা ফাটিয়ে দে। প্রবাল অসহায়-অবাক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, কিন্তু কেন ওকে মারবো ? যাইহোক, আমাকে বন্ধুরা উত্তেজিত করছে, মার্, মার্, মেরে মুখটা ফাটিয়ে দে। আমি যথারীতি ওর মুখে একটা সজোরে ঘুঁসি মারলাম। ও কেঁদে ককিয়ে উঠল। ওর মুখ দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। সামনের একটা দাঁত ভেঙে মাড়ি থেকে খুলে রাস্তায় পড়ে গেল। তারসঙ্গে আমার আঙুলের তলা থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। আসলে ওর দাঁতে লেগে আমার হাতটা কেটে গেছে। প্রবাল মুখ চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে চলে গেল। বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল — বাড়িতে গিয়ে যদি বলিস আমরা মেরেছি তাহলে আরও পেটাবো মনে থাকে যেন। আমিও স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়ানো একটা আইসক্রীমওয়ালার কাছ থেকে একটা আইসক্রীম কিনে দু'বার চুষে নিয়ে হাতটায় চেপে ধরলাম-যেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছিলো।

যথারীতি দাঁত তোলার পরের রোববার সকাল দশটায় আমরা সকলে মিলে দাঁতের ডাক্তারের কোয়াটার্সে গেলাম। ডাক্তার খুব খুশী। একেবারে অন্য চেহারা। আমাকে দেখে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসালো। ও স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলল, অনেকদিন 'ব্যাটা'কে খুঁজছি। এ্যাদ্দিনবাদে পেলাম। ও আমায় ছোটবেলায় মেরে সামনের দাঁত ফেলে দিয়েছিল। ঐ দুঃখ ও যন্ত্রণা আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। তখন থেকে পণ করেছিলাম আমি দাঁতের ডাক্তার হব। আর রুগী হিসাবে যেন এই বন্ধুকে পাই। যাক্, এ্যাদ্দিনবাদে আমার মনের সাধ মিটেছে। ব্যাটা খেতে খুব ভালোবাসে। ওকে ভালো করে খাওয়াও। কতদিন বাদে ওর সঙ্গে দেখা। ছোটবেলার বন্ধুকে দেখলে মনটা খুশীতে ভরে ওঠে।

আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আর লজ্জা দিস্‌নি ভাই, সেই ক্লাস নাইনের ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারিনা। আমি হাতজোড় করে বললাম, তুই আমায় ক্ষমা করে দে ভাই।

প্রবাল গলা ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল, ছোটবেলায় এরকম ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটে। ওটায় কিছু মনে করতে নেই। তুই আমার দাঁত ভেঙেছিলি বলে, তবেই না আমি আজ ডাঃ প্রবাল দত্ত, ডেন্টিস্ট।

সাইজ

পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সুমনা উর্মীকে বলল — হ্যাঁরে, তোর এত বয়স হোল কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান হলো না। কেন? কি হয়েছে? বারে, এর মধ্যেই ভুলে গেলি। পার্ট ওয়ান ফিজিক্স অনার্সের পরীক্ষা কত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রেসিডেন্সির মতো কলেজের অধ্যাপক, যিনি হলে গার্ড দিচ্ছিলেন মাঝবয়সী ভদ্রলোককে তুই বললি কিনা "গার্ড দিচ্ছেন, গার্ড দিন, কিন্তু বারবার আমার বুকের দিকে দেখছেন কেন? আমার লেখার অসুবিধা হচ্ছে। যা মনে করার চেষ্টা করছি, সব গুলিয়ে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছি।" সুমনা বলে, তোর কথা শুনে চমকে পরীক্ষার খাতা থেকে মুখ তুলে দেখি ভদ্রলোকের ফর্সা মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। এরকম ভাবে কেউ কখনো স্যারকে বলে? তুই খুব অসভ্য, ছিঃ ছিঃ, এইজন্যই বলি, তোর বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি একটুও হয়নি। কোথায় কি বলতে হয় জানিস না। উর্মী বিজ্ঞের মত বলে — শোন, শোন, অত অল্পেতে কারুর বিষয়ে ধারণা করবি না, মন্তব্যও করবি না, বুঝলি? সুমনার মনটা খারাপ হয়ে যায় বলে — উর্মী, তুই রাগ করিস না। তুই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বলে বলেছি, তা নইলে বলতুম না। যাক্‌গে, ওসব কথা থাক। এখন তুই বলতো, কি করে তোর বুকটা অত সুন্দর লাগছে। আমার সঙ্গেই তো তুই ব্লাউজ কিনিস, বত্রিশ সাইজের, কিন্তু ছত্রিশ এর মতো লাগছে। খুব বেশী প্যাড দেওয়া ব্রেসিয়ার কিনেছিস। তাহলেও তো ছত্রিশ এর মতো লাগবে না। হার্বাল ম্যাসেজ অথবা সিনেমা আর্টিস্টদের (নায়িকা) মত সিলিকন ইঞ্জেকসন্ নিয়েছিস? বল না রে উর্মী, কি করে এত সুন্দর হলো? উর্মী মুচকি হেসে বলল — সে অনেক রহস্য। এখানে বলা যাবে না। কফি হাউসে গিয়ে কোল্ড কফির সঙ্গে মার্টন কবিরাজী যদি খাওয়াস, তাহলে বললেও বলতে পারি। সঠিক কথা দিতে পারছি না। আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোকে নিশ্চয়ই খাওয়াবো। কিন্তু রহস্যটা বলতেই হবে। আসলে আমার চেহারা অনুযায়ী বুকগুলো একটু ছোট বলে হীনমণ্যতায় ভুগি।

যথারীতি উর্মীর চাপে পড়ে সুমনা কফি হাউসের দোতলায় উঠে একটা ফাঁকা কোনের দিকে, চেয়ারে বসল যাতে উর্মীর কথা অন্য কেউ শুনতে না পায়। কোল্ড কফি ও মার্টন কবিরাজীর অর্ডার দিয়ে অনেক আকুতি করে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। উর্মী একটু করে কবিরাজীতে চামচ করে টুকরো কোরে আস্তে আস্তে মুখে পুরছে আর সুমনাকে বলছে ধীরে, বন্ধু, ধীরে। যখন খাইয়েছো তখন নিশ্চয়ই বলব। অপেক্ষা করো। অপেক্ষা

করতে না শিখলে জীবনে বড় হওয়া যায় না, বুঝেছো ! অগত্যা সুমনা মুখ ভেচ্‌কে অপেক্ষা করে কখন উর্মী বোলবে। খাওয়া দাওয়ার পর মুখে ভাজা মৌরী চিবোতে চিবোতে এদিক ওদিক দেখে উর্মী ওর ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা একটা করে ফর্মূলা লেখা গোল কাগজের পুরিয়া বার করে টেবিলের নীচে ফেলে দিতে লাগলো। সব পুরিয়া বের করার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল — বত্রিশ, বত্রিশেই আছে-বুঝলি হাঁদারাম। আমি এখন নিউ মার্কেট যাচ্ছি-ভ্যালেন্টাইন ডের কার্ড কিনতে, চলি-টা, টা, বাই - ই.........।

স্বয়ংবর সভা

সুবল ড্রাইভারের মেয়ে সরমা, সবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে কলেজে ভর্তি হবে, এমন সময় একদিন সকালে সুধাময়ী ওর স্বামী সুবলকে বলল — "ঢের হয়েছে মেয়ের আর পড়ার দরকার নেই। এবার ওর ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দাও। যা দিনকাল পড়েছে গরীবের ঘরে বেশীদিন আইবুড়ো মেয়ে রাখা ঠিক নয়। অগত্যা সুবল মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে "কিরে মা, বিয়ে কববি তো ? তোর মা তো তোকে আর কলেজে পড়াতে চাইছে না"। সরমা আব্দার করে বলল — করতে পারি কিন্তু একটা শর্ত আছে। কি শর্ত ? আগামী সাত দিনের মধ্যে তোমায় ড্রাইভার পাত্র যোগাড় করতে হবে। বয়স আমার চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ বছরের বড়, সুস্বাস্থ্য আর মাথায় আমার চেয়ে লম্বা। পুরোনো দিনের মত স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করতে হবে। যাকে আমার পছন্দ হবে তার গলাতেই আমি মালা পরাবো।

সুবল সাতদিনের মধ্যে তিনটে পাত্র যোগাড় করে বাড়িতে স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করল। সরমার শর্ত অনুযায়ী, তিনটে হাতলছাড়া কাঠের চেয়ারে তিন পাত্র বসে আছে। একজন দুটো হাত সামনে ঝুলিয়ে সামান্য ঝুঁকে, দ্বিতীয়জন শিরদাঁড়া সোজা করে টান টান হয়ে আর তৃতীয়জন চেয়ারে একটু ডানদিকে বেঁকে বসেছে।

সুবল সরমাকে ভিতর থেকে ডাকল। সুধাময়ী সরমাকে নিয়ে পাত্রদের সামনে ধীর পায়ে পদচারণার সঙ্গে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। পাত্রদের বুকে হাপর টানার মতো যেন শব্দ হচ্ছে। মুখগুলো শুকিয়ে কাঠ। কার ভাগ্যে লটারীর টিকিটটা জুটবে কে জানে। এমন সময় হঠাৎ প্রথম জন যে চেয়ারে হাত ঝুলিয়ে সামনে একটু ঝুঁকে বসেছিল, সরমা তার গলাতেই মালা পরালো।

সুবল এর আত্মীয়স্বজন বন্ধু ইত্যাদি যারা উপস্থিত ছিল তারা সবমাকে বলল যে, "তোমায় ব্যাখ্যা করতে হবে কেন সে প্রথম জনকে বরমাল্য দিল। সরমা বলল — যাকে বরমাল্য দিয়েছি সে বাস অথবা লরীর ড্রাইভার। অনেক রোজগার। ফলে সে আমায় ভালভাবে রাখতে পারবে। বড় গাড়ী চালায় বলে মনটাও বড়। দ্বিতীয় জন ট্যাক্সি অথবা প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার। সেইজন্য সে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে আর তৃতীয় জন অটো রিক্সার ড্রাইভার। সেই কারণে সে ডানদিকে সামান্য বেঁকে বসার অভ্যাস। ফলে আমি ঠিক পাত্রকেই পছন্দ করেছি।

ভূতের গল্প

নেমন্তন্ন

অনেকদিন কোন বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন আসেনি। মনটা খুব খারাপ ছিল। এমন সময় হঠাৎ পিওন এসে 'শুভ বিবাহ' ছাপ মারাএকটা হলুদ ছোপ দেওয়া বড় নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেল। পিওনটা চলে যেতেই মনের আনন্দে এত জোরে লাফিয়ে উঠলুম, জাতীয় চ্যাম্পিয়নও বোধহয় এতটা লাফাতে পারত না। পেটুক বলে আমার একটু সুনাম বা বদনাম ছিল। কৈশোর ছেড়ে যৌবনে সবে পা দিয়েছি। ফলে খাওয়ার ইচ্ছেটা পুরোপুরি বজায় আছে। কম বয়স, ফলে যা খাই তাই হজম করে ফেলি। বদহজম / অম্বল / চোঁয়া ঢেকুরের বালাই নেই। যাইহোক, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার বিয়ে বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার পরের স্টেশন বাঘনাপাড়ায়— গণ্ডগ্রাম। স্টেশন থেকে নেমে আলপথ ধরে তিন ক্রোশ পেরোতে হবে। তারপর হাটতলা ছাড়িয়ে আরও দশ-পনেরো মিনিট পরে আমার সেই আত্মীয়াদের বাড়ি-যেখান থেকে নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে।

বাড়িতে অনেক আলোচনার পর ঠিক হ'ল অতদূর যাওয়া সম্ভব নয়, বরং মানি-অর্ডার করে তিনশো টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোক্। মেয়ে তার পছন্দমত শাড়ি কিনে নেবে। আমার তো নেমন্তন্ন খাওয়ার ইচ্ছে। কিছুতেই লোভ সামলাতে পারছি না। গ্রামের শাক্-সবজি, মাছ, সবই টাটকা। আমাদের শহরের মত - অন্ধ্রপ্রদেশের সাত-দশদিন আগের ধরা বরফে ডোবানো মাছ, নানারকম কৃত্রিম সার দেওয়া সবজি নয়। ওখানকার লোকেদের খুব আন্তরিকতা। সাত দিন না থাকলে ছাড়তে চায়না। এতদূর যাচ্ছি যখন, তখন বৌভাতে নেমন্তন্নটাও নিশ্চয়ই জুটবে। শহরের আত্মীয়, যাচ্ছি গণ্ডগ্রাম-তার খাতিরই আলাদা। পারিবারিক মিটিং-এর শেষে সিদ্ধান্ত শুনে হতাশ হয়ে মাকে ধরলুম। ''মা দ্যাখ, আমি একটা তোমায় ভালো মতলব দিতে পারি-এক্ষুণি তিনশো টাকা বেঁচে যাবে।'' — '' কি করে রে খোকা ? তাহলে তো খুব ভালো হয়। মাসের শেষ, ফলে এখন তিনশো টাকা বার করাও খুব কষ্ট।'' আমি বলি — তোমার কোন চিন্তা নেই। পারুল বস্ত্রালয় থেকে তো তুমি মাঝে-মধ্যে শাড়ি কেনো, মাসে মাসে দাম দাও। সেরকম একটা শাড়ি কিনে আনো এখন একশো টাকা দিয়ে। পরের দু'মাসে আরও একশো টাকা করে দিলেই ধার শোধ। আর আমাকে গাড়ি ভাড়া পঞ্চাশ টাকা দাও। তাহলেই আপাতত দেড়শো টাকা দিলেই সব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে হয়ে যাবে। এখনই ঘর থেকে তিনশো টাকা বার করতে হবে না। মা স্নেহমাখানো হাতে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন — তোর তো

খুব বুদ্ধি বঙ্কা (বঙ্কিম থেকে বঙ্কায় রূপান্তরিত) তবে লেখাপড়াতে আর একটু বুদ্ধি খাটালে আমরাও শান্তি পেতুম, তোরও উন্নতি হ'ত।

যাইহোক, দু'তিন দিন বাদে ভোরবেলায় হাওড়া থেকে ফার্স্ট কাটোয়া লোকালের একটা কামরায় উঠে জানালার ধারে বসে পড়লাম। ডিজেল ইঞ্জিনের গাড়ি। তখন ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়নি। বেলা এগারোটা নাগাদ বাঘনাপাড়া স্টেশনে নেমে হাঁটা শুরু করে দিলাম। এমন রাস্তা যে গরুর-গাড়িও চলে না। আলপথ ধরে হোঁচট খেতে খেতে একটা নাগাদ বিয়েবাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। ঐদিন রাত্রেই বিয়ে। আমি পৌঁছতেই হৈ হৈ করে সবাই ছুটে এল। বাড়ির প্রবীণ সদস্য/সদস্যারা আমার বাবা, মা, ঠাকুমা কেমন আছেন সব খোঁজ-খবর করতে লাগলেন। তারপর খাওয়া দাওয়া মিটতে বেলা দুটো হয়ে গেল। ভেতরের ঘরে চৌকিতে বিছানা পাতাই ছিল। একটা হাতপাখা নিয়ে শুয়ে পড়লাম। গ্রামে ইলেকট্রিক খুঁটি পোঁতা আছে, কিন্তু কবে ইলেকট্রিক আসবে কেউ বলতে পারে না। একমাত্র ভোটের আগেই ভোটপ্রার্থীরা আশার ফুলঝুরি ছোটায়। সেইজন্য গ্রামবাসীরাও জেনে গেছে ওটা ভোট কুড়ানোর কৌশল। অন্ধকারেই তাদের দিন গুজরান করতে হবে।

সারাদিন ট্রেনের ক্লান্তিতে ঘুমটা বেশ গাঢ় হয়েছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। এক কাপ চা ও লোকাল কালনা বেকারীর বিস্কুট খেয়ে হাটতলার দিকে বেরুলাম। একটু পায়চারী না করলে রাতেয় ক্ষিদেটা বেশ জমবে না। খানিকটা হাঁটার পর হাটতলায় এসে দেখি দু-একটা মাটিব দেওয়াল, খড়ের চাল দেওয়া চায়ের দোকান, একটা মুদিখানার দোকান খোলা আছে। সপ্তাহে দু'দিন সকালে হাট বসে বুধবার আর রবিবার। আজ শনিবার ফলে হাটতলা ফাঁকা, শুনশান। গালে হাত দিয়ে দেখি খস্‌খস্‌ করছে। গতকাল সকালে কাটা দাড়ি একটু বেড়ে গেছে। আজ বিয়েবাড়ি, ফলে বরের পাল্কি আসার আগে দাড়িটা কামাতে পারলে ভাল হ'ত। দূরে দেখি মাটির দেওয়াল ও টালির চালের একটা দোকান। টালির চালেব একপাশ একটু ঝুলে বেঁকে রয়েছে। এখানে দোকানগুলোর সব খড়ের চাল, শুধু ঐ দোকানটা টালি দিয়ে ছাওয়া বলে কৌতুহল বশতঃ ঐ দোকানের কাছে গিয়ে উঁকি মারতেই দেখি দেওয়ালে একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ বা বেল্টের মত ঝুলছে। দেখেই বুঝলাম — মেঘ না চাইতেই জল। আমি যার সন্ধানে এসেছি এটা সেই সেলুন। লোকটার খুব রোগাটে গড়ন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখগুলো গর্তে ঢোকা। গায়ে জামা-গেঞ্জি কিছুই নেই শুধু হাঁটুর উপরে আট হাতি কোরা ধুতি তাও খুবই ময়লা-চিমটি কাটলে ময়লা উঠবে। গ্রামের অভাবী মানুষ-সাবান কেনারও ক্ষমতা নেই।

মায়া লাগল। বললাম দাড়ি কাটা যাবে ? সে নাকি সুরে খোনা গলায় বলল — হ্যাঁ। নড়বড়ে একটা চেয়ারে বসলাম। সে গালে সাবান লাগাতে লাগল। ইতোমধ্যে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। আমি বললাম, হ্যারিকেন বা লম্প ফম্প জ্বাল ভাই তা নইলে দাড়ি কাটবে কি করে ? সে কোন কথার জবাব না দিয়ে অন্ধকারেই দাড়ি কাটতে লাগল। দাড়ি কামানোর পর জিজ্ঞেস করলুম কত দোব ভাই ? ষোঁল আঁনা দেন। আমি অবাক। আমাদের বাড়ির কাছের সেলুনে পাঁচ টাকার কমে দাড়ি কাটে না। ক্রীম দিয়ে কাটলে আরও বেশী। এই লোকটাকে দেখে মনে হয় ভাল করে পেট ভরে খেতে পায়না তাইতেই সে মোটে এক টাকা চাইছে। ঐ জন্যেই বোধহয় খেতে পায়না। গ্রামের লোকেদের অবশ্য আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। দু'টাকা চাইলে দেওয়ার সামর্থ্য হয়ত অনেকেরই হবে না।

বাড়ি ফিরতেই সকলে হৈ-চৈ করে উঠল — শহরের ছেলে, অন্ধকারে কোথায় ঘুরছিস্ এতক্ষণ ? বিয়েবাড়িটা হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে। দূরে ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা বাজার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তারমানে বরপক্ষ আসছে। আমি বললাম — এই কাছেই হাটতলার কাছে দাড়ি কামাতে গেছলাম। ওখানকার সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। সকলে সমস্বরে বলল — 'সে কিরে বঙ্কিম, ওখানে তো কোন সেলুন নেই। প্রায় এক যুগ আগে হরিশ নাপিতের একটা টালির চালের সেলুন ছিল বটে তবে অভাবের তাড়নায় ঐ দোকানেই সে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে মরেছিল।'

একটা হিমশীতল স্রোত ক্রমশঃ শিরদাঁড়া দিয়ে নীচে নামতে লাগল। খাওয়ার চিন্তা মাথায় উঠে গেল। সারা রাত না ঘুমিয়ে পরের দিন ভোরবেলা কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে বিছানায় বালিশের তলায় ছোট্ট একটা হাত চিঠি লিখে রাখলাম — চল্‌লাম।

আচার-বৌদি

অফিস থেকে বাড়ি ঢুকতেই শুভ্রা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল — ‘‘জানো তো এইমাত্র তোমার বৌদি এলেন। খুব আনন্দ হচ্ছে— কতদিন বাদে এলেন, সঙ্গে তাঁর নববিবাহিত স্বামীকেও এনেছেন। পাশের ঘরে সবে বসিয়েছি এমন সময় তোমার কলিং বেলটা বেজে উঠল। নাও, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে বৌদিদের সঙ্গে দেখা কর।’’ আমি বলি, এতক্ষণ তো অনেক কথাই বললে, কোন বৌদি সেটা তো বললে না। বৌদি তো অনেক আছে। ইনি তোমার আচার বৌদি গো। এবার মনে পড়ল।— হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অনেকদিন আগের ছবিটা ভেসে উঠল। খুব ছোটবেলায় বৌদি যখনই আমাদের বাড়িতে আসতেন, সঙ্গে নানারকম তাঁর নিজের হাতের তৈরী আচার নিয়ে আসতেন। গ্রামের মেয়ে, রঙটা কালো হলেও, মুখশ্রী সুন্দর। তার চেয়েও সুন্দর তার ব্যবহার ও হাতে তৈরী আচার। আম, এঁচোড়, ফলসা, লেবু কত কি! বৌদি এলেই আমরা ভাই-বোনেরা তাঁকে ছেঁকে ধরতুম, আচার খাওয়ার লোভে। কবে যে তাঁর আসল নাম ভুলে আমাদের কাছে আচার বৌদি হয়ে গেছেন তা মনে করতে পারি না। শুভ্রার কথাটা মনে বাজছে— বৌদি নব-বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে এসেছেন। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। যাক্, এতদিনে একটা হিল্লে হ’ল। গ্রামের অভাবী ঘরের মেয়ে। বাগান, পুকুর সবই আছে কিন্তু নগদ টাকার খুবই অভাব সেইজন্য বুড়ো দোজবরের সঙ্গে বৌদির বাবা বিয়ে দেন। দাদার বয়স হয়েছে, খুব খিটখিটে স্বভাবের। শান্তি কোনদিন পাননি। কিন্তু এই বয়সে আবার বিয়ে করলেন, সেটাই ভাবছি, মন না মতিভ্রম। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে শুভ্রা চেঁচিয়ে বলল, কিগো? হাত মুখ ধুতে কতক্ষণ লাগে? তোমায় বললাম না যে বৌদিরা ঘরে অপেক্ষা কবছেন। তাঁদের সঙ্গে একটু গল্প কর। আমি এখনই চা করে নিয়ে যাচ্ছি।— শোনো, শুধু তোমার আব আমার চা-ই কর। কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলাম — শিয়ালদা স্টেশনের কাছে বাস দুর্ঘটনায় বৌদি মারা গেছেন।

স্নেহের টান

সরমার বরের রেলের বদলির চাকরি। মফঃস্বল থেকে কোলকাতার শিয়ালদা স্টেশনে সম্প্রতি বদলী হয়ে এসেছে। শিয়ালদার কাছে রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে বড় রাস্তার ধারে ছোট দোতলা এক বাসা বাড়িতে সরমা তার সংসার পেতেছে। সংসার বলতে সরমার বিধবা শ্বাশুড়ি, স্বামী ও সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে। ও গ্রামের মেয়ে, ফলে কম বয়সেই বিয়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধ্যান ধারণার আগেই নতুন পরিবেশ। মানিয়ে নিতে নিতেই বৌ থেকে মায়ে রূপান্তরিত। তারপরেই এই কোলকাতায় বদলী। প্রথম শহর দেখা — নতুন পাড়া পড়সি, ট্রাম, দোতলা বাস, চওড়া বড় রাস্তা তার সঙ্গে উঁচু উঁচু আকাশে মাথা ঠেকানো বাড়ি। যা দেখে সবেতেই বিস্ময়। সবকিছুই আবার নতুন করে শেখা।

গরমকাল। সন্ধ্যেবেলায় দোতলার ঘরে ছোট খোকাকে খাটে শুইয়ে সরমা একতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে এসেছে। এমন সময় হঠাৎ বাড়ির আলো নিভে গেল। লোডশেডিং। বাচ্চাটার জন্য সরমার মনটা ছটফট্ করে উঠলো। তার আদরের খোকা অন্ধকারে একা আছে। নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে কেঁদে উঠবে। ও তাড়াতাড়ি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার চাতালে উঠে ঘরের দিকে চোখটা পড়তেই ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠলো। গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো।

ঘরের মোমবাতির আবছা আলোয় সরমা দেখলো — একটা সাদা শাড়ী পরা মহিলা তার কচি ছেলের শিয়রে বসে নীচু হয়ে মুখটা দেখছে ও নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে বাতাস করছে। সরমা ঘরে ঢুকতেই মহিলাটি ঘর থেকে বাইরের বড় রাস্তার দিকে বারান্দায় যাবার দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দে চলে গেলেন। সরমা তাড়াতাড়ি ওর খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো।

সরমার হঠাৎ চিৎকার শুনে ওর শাশুড়ী একতলা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে দোতলায় ঐ ঘরে ঢুকতেই একরাশ উৎকণ্ঠার সঙ্গে সরমা বললো —

— মা, আপনি কি একটু আগে এখানে খোকার খাটে বসে ছিলেন?

— না তো। আমি নীচের তলার বাইরের ঘরেই বসেছিলাম। কেন? কি হয়েছে? খুব ভয় পেয়েছো বলে মনে হচ্ছে।

— দেখুন না, আলো নিভতে ওপরে এসে মোমবাতির আবছা আলোয় দেখি আপনার নাতির মাথার দিকে ঝুঁকে পড়ে সাদা শাড়ি পরা এক মহিলা খোকার মুখটা দেখছেন ও

শাড়ির আঁচল দিয়ে বাতাস করছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি ঐ বাইরের বড় রাস্তার দিকের বারান্দায় যাওয়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওনার পিছু পিছু গেলাম। কিন্তু বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি কেউ নেই। খুব ভয় করলো, সেইজন্য.............।

— ও কিছু নয়, তোমার মনের ভুল বৌমা। কাল সকালে নাতিকে একটু জলপড়া খাইয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর সামনের পূর্ণিমায় নাতির কল্যাণে একটু ⁄সত্যনারায়ণ পুজো দেব। তোমার কোন ভয় নেই। খোকার কিছু হবে না।

কয়েকদিন পরে এক পূর্ণিমার সকালে প্রতিবেশী দুচার জন মহিলা সরমাদের বাড়িতে ⁄সত্যনারায়ণ পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন। পুজোর পাট মিটে যাওয়ার পর সরমার শাশুড়ি-ঐ দিনের সন্ধ্যার ঘটনার উল্লেখ করে তাঁদের জানালেন — নাতির মঙ্গলকামনায় এই পুজোর আয়োজন। প্রতিবেশী মহিলারা ঐ কথা শুনে প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন — বছর কুড়ি আগে এই বাড়ির মালিকের ছোট বৌ, বাচ্চার জন্মদিতে গিয়ে মারা যায়.........।

অণুগল্প

পাতা

বিদ্যালয়ের ছুটির পর সুবোধ রিক্সাওয়ালার রিক্সায় চেপে বাড়ি ফিরছি। বসন্তকালের বিকালের বাতাসে অল্প অল্প শীতের আমেজ। বেশ ভাল লাগছে। মফঃস্বলের রাস্তা, ফলে গাড়ী, লরীর আনাগোনাও প্রায় নেই বললেই চলে। সুবোধ নিজের মনেই গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে রিক্সা চালাচ্ছে। হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করে — বাবু, আপনি তো মাষ্টার মশায় ? হ্যাঁ, কেন ? বলুন না, তাহলে তো আপনি মানুষ গড়ার কারিগর। তা তুই বলতে পারিস। ব্যাটা বিকেলেই নেশা করেছে। নেশা করলেই সুবোধ দার্শনিকের মত কথাবার্তা বলে। সুবোধকে বলি — এই অসময়ে এরকম প্রশ্ন কেন করছিস্ ? ও বলে, জানেন, মাস্টারমশায়, দিনকাল খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। মিত্তির ডাক্তারের ছেলের একদম বারোটা বেজে গেছে। আমরা গরীব মানুষ। আমাদের ঘরে ছেলেপুলেরা খারাপ হতেই পারে, কিন্তু, অতবড় ডাক্তার। ওনার বৌও তো ডাক্তার। অত পয়সা, মান সম্মান। আমি তাই ভাবছি তাদের একমাত্র ছেলের এই অবস্থা হোল কেন ? আপনি তো মাষ্টারমশায়, বলুন না, কেন এমন হয়। সুবোধ, তুই সব কথা খুলে বল। তা না হলে তোর কথার জবাব দিতে পারব না। তাহলে শুনুন — আজ সকালে মিত্তির ডাক্তারের ছেলে আমাকে জিগ্যেস করল — সুবোধদা, স্টেশনের দিকে পাতা কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার ? কাছাকাছি খুব ঝামেলা হচ্ছে সেইজন্য ষ্টেশনের দিকের খোঁজ করছি। আমি বলব না, বলব না ভেবেও তার পীড়াপিড়িতে ঠিকানাটা বলে দিলুম। ও খুশি হয়ে আমার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিল। পাতার ঠিকানা বলার বখশিস। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এক গেলাস চাপিয়ে দিলুম। বলুন না বাবু, কেন এমন হয় ? আমি অবাক হয়ে বলি — মিত্তির ডাক্তার আর তার বৌ তো অ্যালাপাথি ডাক্তার। ওর ছেলে কি কবিরাজি ডাক্তারি পড়ছে যে, পাতার খোঁজ করছে ? কি গাছের পাতা সেটাও তো বললি না। সত্যি মাষ্টার মশায়, আপনার মাথাটাই গোল্লায় গ্যাছে। এ পাতা সে পাতা নয়। এ পাতা হেরোইন। যারা হেরোইন এর নেশা করে তারা শর্টে পাতা বলে। আপনার দ্বারা কিস্যু হবে না। আমার এতক্ষণ বকাটা বেকার হয়ে গেল। এক্ষুণি আর এক গেলাস না চাপালে আর শান্তি নেই।

ভুবনদা

মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের নিকটবর্তী এক গ্রামে আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে এক নিম্নবিত্ত পরিবারে ভুবনদার জন্ম। মাতঙ্গিনী হাজরা, ক্ষুদিরামদের মতো মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশে জন্ম বলে ভুবনদা খুব ছোট বয়সেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন তাঁর চোখ জুড়ে। স্থানীয় ভাবে কংগ্রেসের মিটিং, মিছিল, সমাবেশে ভুবনদার অনুপস্থিতি কেউ দেখেনি। ১৫ই অগাষ্ট, ১৯৪৭ দিল্লির লালকেল্লায় রাত বারোটায় যখন ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হবার জন্য ভুবণদা অতিকষ্টে জমানো সঞ্চয় খরচ করে লালকেল্লার মাঠেও উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামের ছেলেছোকরারা ভুবনদাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। কি ভুবন দাদু, তুমি কোন কংগ্রেস ? হাত না ঘাস ফুল। ভুবনদা মুচকি হেসে ঐ স্থান ত্যাগ করে ভাবলেশহীন ভাবে। স্বাধীনতার ছাপান্ন বছর আসন্ন। চারিদিকে খুব ধূমধাম। এমন সময় ১৫ই অগাষ্ট দিনটি এসে গেল। ভুবনদার উপর দায়িত্ব পড়েছে গ্রামের পাঠাগারের ছাদে পতাকাউত্তোলন করার। সকাল আটটায় পতাকা উত্তোলন করা হবে। ভুবনদা যথারীতি আটটার একটু আগে পাঠাগারের ছাদে উঠেছেন তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা বুকে ধবে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। এক্ষুণি আকাশভাঙ্গা বৃষ্টি নামবে। এমন সময় পাশের নারকেল গাছে বিকট শব্দে বাজ পড়ল। চারিদিক আলোয় উদ্ভাসিত। সম্বিৎ ফিরলে দেখা গেল ভুবনদার নিষ্প্রাণ, নিথর দেহটা, হাতে স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

অবসর

দাদা, একটা টাকা হবে ?

গভীর ভরাট গলার আওয়াজ শুনে দিল্লি প্রবাসী সুশান্ত চমকে উঠল। কোলকাতায় দুর্গাপুজো দেখতে এসেছিল আত্মীয়ের বাড়িতে। খুব চেনা কণ্ঠস্বর, কিন্তু মনে করতে পারছিল না। প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক। কেন্দ্রীয় অডিট (Central A.G.) অফিসের দুঁদে আমলা মুখার্জী সাহেবের একি হাল ! স্বপ্ন দেখছে না তো ! নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সুশান্ত বলল, 'স্যার, আমাকে চিন্‌তে পারছেন ? না, না, আমি কারুর স্যার নই। আমি কাউকে চিনি না। দয়া করে একটা টাকা হবে ? চা খাব। সেই কোন সকালে বেরিয়েছি, এখনও এক কাপ চা জোটেনি। খুব দরদী কণ্ঠে সুশান্ত একান্তে ডেকে বলে — "স্যার, এবার নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছেন। কেন এমন হল !" তুমি তো জান, জীবনে এক টাকাও ঘুষ নিইনি। কোন অন্যায় আবদারের কাছে মাথা নোয়াইনি। চাকরিসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে কবে যে নিজের সংসারের থেকে দূরে সরে গেছিলাম — তা জানতে পারি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পরে। কোলকাতায় নিজের বাড়িতে যখন এলাম, তখন আমার স্ত্রী, পুত্রদের কাছে আমি ব্রাত্য। তারা বললে — তোমার অফিসই এতদিন ছিল তোমার একান্ত আপন। আমরা পর ছিলাম। ফলস্বরূপ, আমার অবসর গ্রহণের প্রাপ্য টাকা পয়সা মায় পেনসনের টাকাটাও, আগাম চেকে সই করিয়ে নিয়েছে। বাধা দিলে, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। কোনমতে রাতে শোয়ার জন্য সিঁড়ির তলায় একটা চৌকি দিয়েছে। সারাদিন তোমাদের মত শুভানুধ্যায়ীদের কাছে চেয়ে চিন্তে পেট চালাই বেঁচে থাকার জন্য। পুরোনো সব কিছু ভুলে গেছি। ভালো থাকো। চলি।

তাড়না

সময়টা ১৯১৭-১৮ সাল হবে। চারিদিকে নকশাল আন্দোলনের জোয়ার। কলেজে পড়ার সময় একজন তাত্ত্বিক নেতার সংস্পর্শে এলাম। তিনি আমাকে দেশে বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য একজন নিভীক, নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসাবে চিহ্নিত করলেন। তিনি বল্লেন, সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র দেশের মুক্তির পথ। যে যত বেশী শ্রেণীশত্রু খতম করতে পারবে এবং লাল বইটাকে কণ্ঠস্থ করতে পারবে, সে তত বড় নেতা। অতএব নির্দেশ এল, বর্ধমান জেলার নাদনঘাটে একজন পুলিশ অফিসারকে খতম করতে হবে। এইভাবে ক্রমশঃ দক্ষিণবঙ্গে ছাড়িয়ে উত্তরবঙ্গেও শ্রেণীশত্রু খতম করার ডাক পড়ল। ইতিমধ্যে পুলিশের পক্ষ হতে দৈনিক খবরের কাগজের প্রথম পাতায় কালো বর্ডার দিয়ে বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগল — নকশাল নেতা জলধব ঘোষকে জীবিত অথবা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার। পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে....... তারপর দীর্ঘ সময় কেটে গেল ...... পেট চালাতে নানা ধরনের কাজ করতে কবতে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে....... কখন যে বিরাট কাঠ ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছি, নিজেই জানিনা। ভাবতবর্ষের বাইরেও কাঠ বপ্তানী করে বিদেশী অর্থের আমদানী করছি। অনেকদিন অতিক্রান্ত।

বডছেলেকে কাঠের ব্যবসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে শিলিগুড়ি শহরে বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ি বানিয়েছি, গ্যারেজে দেশি-বিদেশি তিনখানা গাড়ি। কয়েকটা লাক্সারী বাস ও লরি কিনে ছোট ছেলেকে পরিবহন ব্যবসায় নামিয়েছি। স্বচ্ছল অবস্থা। কেউ মনে বাখবে না কবে কোন কাগজে জলধব ঘোষের নামে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হয়েছিল। ডি.এম., এস.পি. ছাড়াও এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই আমার বাড়িতে চা খেতে আসেন। এখন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে পরিচিত। এলাকার বিভিন্ন বড় স্কুল, কলেজ স্পোর্টস ক্লাব ইত্যাদিতে সভাপতি অথবা সম্পাদকরূপে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। জীবনের সায়াহ্নে ভাবি কি ছিলাম! কি পেলাম! এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। উত্তরবঙ্গ বালিকা বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় এসেছে, এখনই যেতে হবে। যাইহোক, নতুন কেনা লাল বিদেশি গাড়িতে চেপে মিনিট পনেরোর মধ্যে স্কুল পৌঁছে গেলাম। ইন্টারভিউ চলছে। আমি সম্পাদক, প্রধান শিক্ষিকা ও বিষয় বিশেষজ্ঞ তিনজনে ইন্টারভিউ নিতে নিতে হিম্‌শিম্ খাচ্ছি। এমন সময় খুবই সাধারণ ছিপছিপে লম্বা

শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে প্রণাম করল। নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা বলার পরেই কাতরস্বরে বলল, ''আমার চাকরিটার খুব প্রয়োজন। সেইজন্য বর্ধমানের নাদনঘাট থেকে এতদূর এসেছি।'' আমার তো হারাবার কিছু নেই। আমার বাবা পুলিশে কাজ করতেন। নকশালরা তাঁকে খুন করেছিল। তখন আমি খুবই ছোট। আমি একমাত্র সন্তান। আমার মা, আমাকে খুব ছোট বয়স থেকেই অনেক কষ্ট, দুঃখের মধ্যে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। চাকরিটা পেলে, মা আর আমি এখানে বাসা ভাড়া করে থাকব। মেয়েটি চলে যাবার পর বিবেকের তাড়নায় পিষ্ট হয়ে, বাকী দু'জনকে বললাম চাকরিটা যেন ওই মেয়েটাই পায়।

জয় শ্রীরাম

আধা গ্রাম আধা শহর অঞ্চলে রূপসার বাড়ি। বাড়িতে বাবা, মা, ঠাকুমা আর একমাত্র ছোট্ট ভাই। ভাই খুবই ছোট, সবে কিছুদিন হ'ল শিশুশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছে। রূপসাকে বাড়ির সকলে খুব ভালবাসে। ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। পড়া শোনা ছাড়াও ছবি আঁকা আর গানে খুব আগ্রহ। সেইজন্য ওর বাবা, মা, গান ও ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করেছেন। ও খুব খুশী। ওর গানের দিদিমণির খুব নাম। বেতার ও দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী। রূপসা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখে।

একদিন শনিবার সন্ধ্যাবেলায় গান শিখে ও যখন বাড়ি ফিরছে এমন সময় গ্রামের পাঠাগারের কাছে হঠাৎ লোডশেডিং। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। একহাত দূরের লোক দেখা যাচ্ছে না। ঐ পাঠাগারের কাছ থেকে পাঁচ মিনিট দূরেই ওর বাড়ি। ও তাড়াতাড়ি ভয়ের চোটে 'জয় শ্রীরাম', 'জয় শ্রীরাম', নাম জপ্‌তে শুরু করেছে। এমন সময় হঠাৎ ওর মনে পড়লো — এই পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক রাম জ্যেঠুতো গত পরশু দিন রাত্রে ঐ পাঠাগারের মধ্যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এখনও তিন রাত্তির কাটে নি। ঠাকুমা বলেন — 'তে রাত্তির না কাটলে যার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে তার ভূত ড্যাংড্যাং করে ঘুরে বেড়ায় আত্মার' মুক্তির আশায়। ফলে তার ভূতকে যে কেউই যখন তখন দেখতে পায়। আর শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে তার আত্মা আকাশে চলে যায়।

যেই এই কথাটা তার মনে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ওর হাত-পা কেঁপে উঠলো, বুকটা ধড়াস্ করতে লাগল। একটা হিম ঠাণ্ডা স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নাম্‌তে লাগল।

ও যে 'জয় শ্রীরাম' নাম জপ্‌ছিলো এখন ওর 'রাম' ডাক শুনে ঐ পাঠাগারের রাম জ্যেঠু যদি ওর সামনে এসে দাঁড়ায়-তাহলে কি হবে? রূপসা আর ভাবতে পারে না। প্রাণের ভয়ে ঐ অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির দিকে দৌড়তে থাকে। বাড়ির বাইরের গেট্‌টা এক ঝটকায় খুলে সদর দরজায় গিয়ে আছড়ে পড়ে।

হঠাৎ দরজায় আওয়াজের শব্দে ওর বাবা, মা হ্যারিকেনের আলো নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দেখেন — রূপসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তক্ষুণি ওকে ওর বাবা, মা কোনরকমে তুলে এনে ওব বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ওর বাবা মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন। মা হাতপাখা নিয়ে ওর মাথায়, গায়ে পাখার বাতাস দিতে লাগলেন। ওর

ঠাকুমা খানিকটা কাগজ পুড়িয়ে ওর ধোঁয়াটা রূপসার নাকের কাছে ধরলেন। রূপসার বাবা ঠাকুমাকে বললেন — 'মা, কার্বনের ধোঁয়া ওর নাকে দিচ্ছো কেন? ওটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'। — তোদের এখনকার বক্তিতা বাদ দে — আমরা চিরকাল শুনে এয়েচি — ধোঁয়ার গন্ধে ভূত পালায়-একে শনিবার তায় আজ অমাবস্যা। ভূতগুলো চারদিকে কিল্‌বিল্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার নিয়মে আমায় চলতে দে। তবুতো কাগজ পোড়াচ্ছি। চটি বা জুতো পুড়িয়ে চামড়া পোড়ার গন্ধ শোঁকালে আরও ভাল কাজ হ'ত।

রূপসার বাবার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। মার মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারলেন না। এমন সময় বাড়ির আলোগুলো জ্বলে উঠল। রূপসার মা বললেন — যাক বাবা, বাঁচা গেল। মেয়েটার এই বিপদে এখন যদি আলো না আসত তাহলে কি কাণ্ডটাই না হ'তো।

এমন সময় রূপসা একটু চোখ খুলে তাকালো। মুখটা হাঁ করে ইশারায় জল পান করতে চাইলো। ওর ঠাকুমা তাড়াতাড়ি এক কাপ গরম দুধ এনে চামচে করে খাইয়ে দিতে লাগলেন। তারপর রূপসার বাবার উদ্দেশ্যে বললেন — দেখলি তো ভূত পালাল কাগজ পোড়া গন্ধে। তোরা তো বিশ্বাস করতে চাস না।

সবাই মিলে রূপসাকে গায়ে, পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। ছোট্ট ভাইটা এসব কাণ্ড দেখে মার হাতটা জড়িয়ে ধরে দিদিকে বললো — দিদি ভয় নেই। আলো এসে গ্যাছে। আর ভূত ধরবে না। রূপসা একটু সুস্থ হতে রূপসার বাবা ওকে বল্‌লেন — কি হয়েছিল মা, এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলি কেন? রূপসা বলে — জানো বাবা, তিন সত্যি করে বলছি-যতই ভূতের ভয় পাই না কেন আর কোনোদিন 'জয় শ্রীরাম' বল্‌বো না। প্রাণ থাকতে নয়, মরে গেলেও নয়।

রক্ত

হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে সুধীরের বাড়ি। আগে গণ্ডগ্রাম ছিল এখন শহরের ছোঁয়া লেগেছে। ছোটবেলায় বাবা মার যাবার পর খুবই আর্থিক টানাটানির মধ্যে বিধবা মা ও তার নিজের পেটের জ্বালা জুড়োনোর জন্য গাড়ী, বাস, মেরামতির গ্যারেজে দৈনিক কুড়ি টাকা রোজে পচা মিস্ত্রির হেল্পারের কাজে লেগে যায়। সকাল থেকে রাত হাড়ভাঙা খাটুনি। এইভাবে কিছুদিন চলার পর সুধীর ভাবে এইভাবে চিরকাল চলবে না। অন্য কিছু কাজের যোগাড় করতে হবে।

আগের ডোমজুড় আর নেই। অনেক রুটের বাস/ মিনিবাস এই রুটে চলে, যেমন ডোমজুড়-হাওড়া, ডোমজুড-কোন্নগর ইত্যাদি। ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন রুটের ড্রাইভারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বাস/ মিনিবাস চালানোটা শিখে নিল। ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও বার করল একদিন। তারপর ডোমজুড়-হাওড়া রুটের মিনিবাস চালানোর কাজটা জুটে গেল। এখন আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হয়েছে। মাকে আর লোকের বাড়ি কাজ করে খেতে হয় না। বাড়ীতেই থাকে, ঘর-সংসার দেখে।

মিনিবাস চালানোর চাকরিটা পাকা হবার পর ওর মা একদিন বলেন,

— খোকা, এবার বিয়ে থা করে ঘরে একটা বৌ আন্। কবে আছি কবে নেই। মরার আগে তোর সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে যাই। কোন্ কালে তোর বাপ্ মরেছে — শেষ কালটায় একটু নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করি।

— আমি তো সকালে কাজে বেরোই, রাত্তিরে বাড়ি ঢুকি। শুধু শুধু পরের বাড়ির মেয়েকে এনে কষ্ট দেওয়া।

— তোর চিন্তা কি? আমি তো আছি। বৌমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি মেয়ে দেখছি।

তিন-চার মাস পরে হাওড়া জেলারই মাকড়দহ অঞ্চলের রমলার সঙ্গে সুধীরের বিয়ে হয়ে গেল। মোটামুটি সুখেই ঘর-সংসার চলছিল সুধীরের। ক্রমে বছর গড়িয়ে চলে তার নিজস্ব গতিতে। দুটো সন্তানের বাপ হয়েছে সুধীর। বড় মেয়েটার বয়স সাত, ছোট ছেলেটার চার বছর।

কিছুদিন ধরেই রমলা লক্ষ্য করছিল ছেলেটা যেন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিছু খেতে চাইছে না। প্রায়ই ঘুস্‌ঘুস্ জ্বর হচ্ছে। ওর ভালো লাগছে না। রমলা ভয় পাচ্ছে।

ওর শাশুড়ী মাকে জানাল, সুধীরকেও জানাল। ডাক্তার দেখাবার সময় সুধীর পাচ্ছে না। কাজে ব্যস্ত। একদিন অধৈর্য্য হয়ে রমলা সুধীরকে বলল — "আজ ছেলেকে ডাক্তার দেখাতেই হবে। কাজ কামাই হয় হোক। ছেলেটা যে বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে।" অবশেষে সুধীর ছেলেকে নিয়ে ওখানকার একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। রমলার কাছে ছেলের বিষয়ে সব কথা শুনে ডাক্তারবাবু কোলকাতার একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে বল্লেন — এখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি ছেলের রক্ত পরীক্ষা করে আনতে হবে। পরের দিন সকালে সুধীর ও রমলা ছেলেকে নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করে আনল। তার দু'দিন পরে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারবাবুকে রমলাই দেখাতে গেল। সুধীর বেশী কাজে কামাই করলে পয়সা পাবে না, সেইজন্য রমলা একাই গেল। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পড়ে ডাক্তারবাবুর মুখটা জলভরা মেঘের মত থম্থম্ করতে লাগল। বললেন, তোমার ছেলের থ্যালাসেমিয়া হয়েছে। শরীরে রক্ত কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রক্ত দিতে হবে আর রক্ত হবার জন্য বেদানা, আপেল ইত্যাদি রোজ খাওয়াতে হবে। তোমায় এই ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি কোলকাতার একটা হাসপাতালের। সেখানে এই রোগটারই শুধু চিকিৎসা হয়। ওখানে কার্ড করালে কিছু সুবিধাতে তোমার ছেলের চিকিৎসা হবে। কারণ এটা সারা বছরের ব্যাপার। অনেক টাকা খরচা।

ধীরে ধীরে রমলা ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এল। পা দু'টো যেন চলতে চাইছে না। কেমন ভারী হয়ে গেছে। কোনরকমে বাড়ি এসে একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। মাথায় কোন কিছু আসছে না। শুধু একটাই চিন্তা, কি করে ছেলে বাঁচবে?

সুধীর যা রোজগার করতো মোটামুটি খাওয়া পরা ভালভাবে চলে যায়। ছোটবেলা থেকে কষ্ট করে বড় হয়েছে বলে ও জানে — মদের নেশা করা পাপ। সেইজন্য তিন-চার ভাঁড় চা ও এক বাণ্ডিল বিড়ি ছাড়া ওর আর নিজের জন্য কোন খরচা নেই। বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যায়। দুপুরে ও রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়া করে। এত কষ্টের মধ্যে ফলের টাকা জোগাড় করাই মুস্কিল। হাওড়া থেকে ফল কারবারী, যারা সুধীরের মিনিবাসে ডোমজুড় আসে, ওর দুঃখের কথা শুনে দু-একটা ফল দেয় ওর ছেলের খাওয়ার জন্য।

ডাক্তার দেখানো, রক্ত দেওয়ার খরচ অনেক। রমলা ওর শাশুড়ীর মত নিয়ে পাশের গ্রামে দু'চারটে বাড়িতে গোয়াল পরিষ্কার, ধান ঝাড়া ইত্যাদির কাজ করে। পেট ভাতা ছাড়াও কিছু টাকাও হাতে পায়। খুবই কষ্ট করে, ছেলেকে বাঁচানোর জন্য। মেয়েকে ও ছেলেকে স্থানীয় স্কুলে পড়তে পাঠায়। নিজে ক্লাস এইটে পাশ করেছে। রাত্রে ছেলেমেয়ের

পড়া ওই দেখাশোনা করে।

শীতকাল। রবিবাব বেলা দশটা নাগাদ রমলাব ছেলেমেয়ে দুটো, মাদুর পেতে দাওয়ায় রোদ পোয়াচ্ছে। সুধীর ও রমলা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। সুধীরের মা, নাতনিকে থালায় একটা বেদানা কেটে দিয়ে বললেন — ভাইকে খাওয়া। নিজেও খানিকটা খাবি। সবটা ভাইকে দেওয়ার দরকার নেই। তোরও মুখটা শুকিয়ে গেছে। ফ্যাকাসে লাগছে।

রমলার মেয়ে, ভাইকে বেদানার একটা একটা করে কোয়া ছাড়িয়ে খাওয়াচ্ছে। ভাই খেতে না চাইলে বলছে — 'ভাই খেয়ে নে, মা বক্‌বে।' ওদের ঠাকুমা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন — হ্যাঁলা, খুকি? তোকে যে বললুম — ভাইকে খাওয়া আর নিজেও খা? সেটা শুনলি না?

ঠাম্মা আমি খাব না। ভাইকে বাঁচাতেই হবে — বেদানা না খেলে ভাইযের তো রক্ত হবে না।

ভেল্‌কি

কোমরে বাতের ব্যথায় সতীশবাবু খুব বিপদে পড়েছেন। অনেক ডাক্তার কবিরাজের কাছে গিয়েও ব্যাথা কম্‌বার লক্ষণ নেই। পূর্ণিমা অমাবস্যাতে ব্যাথা আরও বেড়ে যায়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, অফিসের সহকর্মী যে যার মতন উপদেশ দিচ্ছে। বাঙালী পরস্পরকে উপদেশ দিতে পারলে সবচেয়ে খুশী হয়। কিন্তু কেউ প্রকৃত বিপদে পড়লে, সাহায্যের জন্য কাউকেই পাওয়া যায় না। তাই সতীশবাবু অনেক চিন্তাভাবনা করে অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে ভাত খাওয়া ছেড়ে রুটি খেতে শুরু করেছেন।

পাড়ায় নতুন একজন অস্থি-চিকিৎসক একটা ওষুধের দোকানে বসছেন, সপ্তাহে দু'দিন। তাছাড়া সবে ডাক্তারী পাশ করেছে বলে ফিটাও কম নেবে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ঐ ডাক্তারবাবুকে দেখাতে গেলেন। ডাক্তারবাবু অনেক পরীক্ষা করলেন, আগের দেখানো ডাক্তারবাবুদের উপদেশ মত কোমরের এক্স-রে রিপোর্ট সহ প্রেসক্রিপশন মন দিয়ে দেখে বললেন — শুনুন কোমরের নীচের দিকে শিড়দাঁড়ার একটা হাড় একটু বেড়ে ওপরের হাড়ের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। সেই কারণে যন্ত্রণা হচ্ছে। বাত ফাত্‌ কিছু নয়। আপনাকে কয়েকটা আসন দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা করুণ। পনেরো দিনের মধ্যে না কমলে ট্র্যাকশন্‌ দিতে হবে। আমি, কোমরের বেল্ট কি হবে প্রেসক্রিপ্‌শনে লিখে দিচ্ছি। কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকের দোকান থেকে তৈরী করে নেবেন। সকালে স্নান সেরে বেল্ট পরবেন রাত্রে শোয়ার আগে খুলবেন। কোন গদিওয়ালা চেয়ারে বসবেন না। কাঠের চেয়ারে বসবেন। একটা কাঠের চৌকি কিনে সেটায় শোবেন। কোনমতেই তুলোর গদি বা ফোমের গদিতে শোবেন না। যা বললুম সব মনে করে করবেন — আসন নিয়মিত করবেন।

সামান্য ব্যথা কমার ওষুধ দিয়েছি, যে কোন এ্যান্টাসিড দিয়ে খাবেন।

সতীশবাবু ডাক্তারের উপদেশ মতো বেল্ট তৈরী করেছেন। রবিবার কলকাতার পার্কস্ট্রীট ক্যামাক স্ট্রীটের জংশনের কাছে নীলামের দোকান থেকে সস্তায় একটা শাল কাঠের চৌকি কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরে এলেন। ফিরতে ফিরতে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে।

সন্ধ্যের পর চা-জলখাবার খেয়ে তাস খেলতে বেরোলেন সাহাবাবুর বাড়ি। সেখানে কতকষ্ট করে চৌকিটা কিনলেন তা শোনাতে বন্ধুরাও তাঁকে বাহ্‌বা দিলেন।

রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়ার পর যেই ঘরে শুতে যাবার জন্য ঢুকেছেন। এমন

সময় দেখেন-চৌকিটা সারা ঘরে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের এ কোন থেকে ও কোন। বড ঘরটায় চৌকিটা এভাবে ঘুরছে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। দু'হাত দিয়ে চোখ কচ্‌লে আবার দেখেন চৌকিটা তাঁর বুকের কাছে চলে এসেছে। এই বুঝি তাঁর বুকে ধাক্কা লাগল। ভয়ে পিছিয়ে আসতে গিয়ে দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান ফিরে দেখেন-নার্সিংহোমে বিছানায় শুয়ে আছেন। লোহার খাটের মাথা থেকে দড়ির কপিকলে তাঁর দুটো পা ঝোলানো — ট্র্যাকশন্ চলছে। অবাক হওয়ার পালা এখনও বাকী ছিল। বিকালে ডাক্তারবাবু এসে বললেন — যাক্ এবাব আপনার কোমরের ব্যথাটা সেরে যাবে।

ঘূণপোকা

কোলকাতার কাছে একটা মফঃস্বল শহর রিষড়া। নতুন বাড়ি করে এসেছেন রমেশবাবু। তাঁর স্ত্রী সুতপা ও পাঁচ বছরের ছেলে সুদীপ। রমেশবাবু বাড়ির কাছেই গঙ্গার ধারে জুট মিলে কাজ করেন প্রায় দশ বছর হোল। আগে মগরায় থাকতেন। শীফট ডিউটিতে আসতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে মিলের কাছেই অল্প জমি কিনে বাড়ি করে উঠে এসেছেন। রমেশবাবু খুবই সরল, সিধেসাধা। সাজপোশাকেও কোনরকম বড়লোকী চাল নেই।

স্টেশন ধারে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে টুকিটাকি জিনিষপত্র কিনতে বেরোন স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। একদিন একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল সুতপাদের বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালে যে গ্রামে ছিল, সেই গ্রামেই ঐ ভদ্রলোক থাকতেন। গ্রাম সম্পর্কে সুতপার দাদা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সুতপারা নৈহাটিতে চলে আসে। দেশের লোকেদের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। এতদিন বাদে ভদ্রলোককে দেখে সুতপা খুব খুশী হ'ল। ভদ্রলোকের নাম বিভূতি সাহা। সুতপা বলল — বৌদিকে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসবেন। রমেশবাবুও এখানে ওনাকে নিজের শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক পেয়ে খুশি হয়ে বললেন — সামনের রবিবার বিকালে আমাদের বাড়ি আসুন। আপনাদের চায়ের নেমন্তন্ন রইল। ভদ্রলোক বললেন — ব্যবসা করার তাগিদে বিয়ের ফুরসৎ পাইনি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রে এই দোকানে এসে একটু আড্ডা মেরে পরের দিন কাজে বেরোবার শক্তি সঞ্চয় করি মশাই। এনার্জী ট্যাবলেট এই আড্ডা।

ঐ রবিবার বিকালে উনি রমেশবাবুর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। তারপর যাতায়াত করতে করতে ওনাদের বাড়ির যেন এক সদস্য হয়ে গেলেন। স্টেশনের কাছে সিনেমা হলে ভাল ছবি এসেছে, রমেশবাবুর দুটো দশটা ডিউটি অথচ সুতপার খুব ইচ্ছা সিনেমা দেখবে। অগত্যা অগতির গতি বিভূতিবাবু। কলকাতায় ভাল সার্কাস এসেছে। রমেশবাবুর সারা সপ্তাহ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ইচ্ছে করে না কোলকাতা যাবার। কে ছেলেকে সার্কাস দেখাবে — বিভূতিবাবু। ছেলেকে কে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর দেখাতে যাবে — বিভূতিবাবু। রমেশবাবু ছোট ছেলেকে তো আর একা পাঠাতে পারেন না, ফলে সুতপাও যায়। এই ভাবেই চলতে থাকে। আজকাল সুতপার মধ্যে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য

কবছেন। আগে রমেশবাবুকে ছাড়া সুতপা এক পাও বাড়ির বাইরে যেত না। এমনকি পুজোর বাজার করতে গেলে একমাস আগে তার প্রস্তুতি করত। এখন বলে-তোমার সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তুমি বাড়িতে বিশ্রাম নাও। আমি বিভূতিদার সঙ্গেই ছেলেকে নিয়ে কোলকাতায় পুজোর বাজার করতে যাবো। তোমার কোন চিন্তা নেই।

রিষড়ার একটা নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সুতপা ছেলেকে ভর্তি করালো। রমেশবাবু বললেন, কি দরকার ছিল এখানে ভর্ত্তি করার, কত খরচ! অনেক টাকা মাইনে। পড়ার জন্য অত খরচ করলে নিজেরা খাবো কি? একে তো বাড়ি করার সময় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছি। প্রতিমাসে তারজন্য মোটা টাকা ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করতে হয়। না না, গরীবের বিলাসিতা সাজে না। পাড়ার কাছেই স্কুলে ভর্ত্তি করে দিই। মাইনেও লাগবে না। বইটাও বিনে পয়সায় পাবো। জুটমিল ন'মাস চলে তো তিনমাস বন্ধ। এভাবে চলে না। আমার অবস্থা বুঝে তো চলতে হবে। সুতপা নাছোড়বান্দা-রমেশবাবুকে আব্দারের সুরে বলে, তুমি কি চাও তোমার ছেলে তোমার মত জুটমিলে কাজ করুক।

— না, তা অবশ্য চাই না।

— তবে আমি যা বলছি শোন। ব্যবস্থা একটা কিছু হবে। ছেলেকে ভালো করে পড়িয়ে মানুষ করব। ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার করতে হবে। প্রয়োজনে আমি শাড়িব ফলস্ পাড় বসানো, ব্লাউজ, সায়া তৈরী করব। তবু ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়াবো।

বিভূতিবাবু সুতপাকে মাসিক কিস্তিতে সেলাই মেশিন কেনার ব্যবস্থা করে দিলেন। সায়া, ব্লাউজ সেলাই করে যা লাভ হবে তার থেকে মাসিক কিস্তিতে মেশিনের টাকা শোধ হবে। কোলকাতায় মহাজনের বাড়িতে অর্ডার নিতে যাওয়া, মাল পৌঁছে দেওয়া সবই ভালোভাবেই হচ্ছে বিভূতিবাবুব দয়ায়। বিভূতিবাবু সাহা সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলে আসাম, ত্রিপুরা ও কোলকাতার অনেক কাপড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব। সেই সুবাদে সুতপার ব্যবসা দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। এখন সুতপা আর নিজে সেলাই করে না। দেখাশুনা করে। পাঁচজন কারিগর রেখেছে। ডজন হিসাবে তাদের কাছে মাল বুঝে নেয় ও সেই অনুযায়ী পয়সা দেয়। ছেলে ক্লাশ ফাইভে উঠেছে। ওর জন্য একজন ভালো মাষ্টারমশাই রেখেছে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে এসে পড়িয়ে যান। ছেলে লেখাপড়ায় ভালো। দিন দিন তার পড়ার উন্নতি হচ্ছে। রমেশবাবু খুব খুশী। তিনি ভাবছেন এ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। এত সুখ কপালে সইলে হয়। সুখ অবশ্য বেশীদিন সহ্য হল না। ওর মিলের একজন বন্ধু শান্তি, ইউনিয়নের নেতা

একদিন এসে ওকে একান্তে ডেকে চুপিচুপি বলল, — তোর বৌ বিদেশে যাবার জন্য পাসপোর্ট করাচ্ছে। এবার আর সায়া-ব্লাউজ নয়, রেডিমেড পোশাক রপ্তানী করবে। থানার ও.সি. আমার বন্ধু ওই খবর দিলো। পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য আমার কাছে তোর বৌয়ের খবর খোঁজখবর নিচ্ছিল, যেহেতু আমি তোর সঙ্গে এক মিলে কাজ করি ....।

রমেশবাবু অবাক হয়ে বললেন — হ্যাঁরে, বিদেশ যেতে তো অনেক টাকার ব্যাপার। আমার তো অত টাকা নেই। আমি ছাপোষা লোক। একা একা তো বিদেশে যেতে পারবে না। বিদেশ গেলে অন্ততঃপক্ষে দিন পনেরো তো লাগবে। প্লেনে যাওয়ার খরচ, সেখানে খাওয়া-থাকার খরচ। সহজ ব্যাপার নয়। হ্যাঁরে, ও তাহলে কার সঙ্গে বিদেশে যাবে রে?

— পৃথিবীর সব লোক জানে আর তুই জানিস না। ন্যাকা।

— হেঁয়ালি না করে বলনা রে কার সঙ্গে ও বিদেশে যাবে? ও আগে আমাকে কিছুই বলেনি। বিশ্বাস কর আমি সত্যিই জানিনা। বল্‌না রে, ও কার সঙ্গে যাচ্ছে?

— যার সঙ্গে তোর বউ কোলকাতায় ব্যবসা করতে যায় সেই...........বিভূতিবাবু।

চ্যানেল চলছে

রাত্রে অফিস থেকে ফিরে ড্রইংরুমের সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে খুব রগরগে গা গরম করা টি.ভি. সিরিয়াল দেখছিলাম। মাঝে মাঝে কফি মগে চুমুক দিচ্ছি আর ঐ দৃশ্যগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা মৃদুমন্দ হাওয়ার আবেশে মনটা খুশী খুশী লাগছে।

এমন সুন্দর আমেজটা ভাণ্ডিয়ে ডোর বেলটা বেজে উঠল। একরাশ বিরক্তি নিয়ে রমাকে বললাম — দরজার আইবল দিয়ে দ্যাখো তো কে ওই অসময়ে বিরক্ত করতে এলো? রমা দেখে এসে আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললো — মনে হ'ল পাড়ার দুর্গাপূজা কমিটির ছেলেরা। — দুর্গাপূজার তো এখনও প্রায় তিনমাস বাকী। ওরা এখন থেকেই চাঁদা তুলতে নেমে পড়েছে। যত্ত সব ঝামেলা....... । তুমিই দরজাটা খুলে দাও। রমা সদর দরজা খুলতেই চার-পাঁচ জন যুবক আমার কাছে এগিয়ে এলো। যাইহোক ভদ্রতার খাতিরে ড্রইংরুমেই ওদের বসতে বললাম। আমি বিরক্তি লুকিয়ে মিষ্টি হেসে বললাম — কি ব্যাপার ভাই? পুজোর তো এখনও অনেক দেরী। — দাদা, আমরা চাঁদা তুলতে আসিনি। সামনের বছর আমাদের পুজো পঁচিশ বছরে পড়বে — সেই কারণে আগামী রবিবার সকাল দশটায় পুজো কমিটির মাঠে জরুরী সভা ডাকা হয়েছে। অতি অবশ্যই যাবেন তার সঙ্গে এ বছরের পুজো নিয়েও আলোচনা হবে। আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ আমাদের জানালে ধন্য হব। মনে মনে ভাবছি, চাঁদা দুশো টাকার কম দিলে রাস্তায় কাঁচা গালাগাল দিতে ছাড়বে না — এখন বিনয়ের অবতার।

আমি যতই ওদের এড়াবার জন্য বলছি ঠিক আছে ভাই, নিশ্চয়ই যাব। তোমরা যখন এত কষ্ট করে এসেছো........... । কিন্তু ওরা আমার কথা কানেই নিচ্ছে না — শুধু কথার জাল বুনে চলেছে। কিছুতেই ওঠার নাম গন্ধ করছে না। লক্ষ করছি ওরা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, আমার কথার ঠিকমতো উত্তর দিচ্ছে না। ওদের চোখও ঘরের চারপাশে ঘুরছে। একজন আবার গলা চড়িয়ে বলল — বৌদি একটু চা খাওয়ান। অনেকক্ষণ ঘুরছি।

আমার রাগে গা জ্বলছে কিন্তু মুখে প্রকাশ করছি না, কারণ আমি অফিসে বেরিয়ে গেলে রমা তো একাই বাড়িতে থাকে। ওদেব সঙ্গে ঝামেলায় না যাওয়াই মঙ্গল।

হঠাৎ টিভি-র দিকে চোখ পড়তেই কারণটা বুঝতে পেরে নিঃশব্দে রিমোটের স্যুইচটা

টিপে চ্যানেলটা পাল্টে দিতেই ওরা বললো — দাদা, আজ উঠি — রোববারে ঠিক সময়ে আসবেন কিন্তু।

আমি উঠে গিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলাম।

রাঙাদি

রাঙাদি। চুলে পাক ধরেছে। বয়সোচিত সব লক্ষণই শরীরে স্পষ্ট। বুঝি, বয়স কাউকেই ছেড়ে দেয় না। সে তার আদায় সুদে আসলে মিটিয়ে নিলেও, দূর থেকে চিনতে ভুল হয়নি। এই সেই রাঙাদি। জমিদার বাড়ির মেয়ে ছিলেন। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, পাকা গমের মতো গায়ের রং, আর স্বাচ্ছল্য ? সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না, হাতে কানে সবই পরতেন হীরের। অসম্ভব ভালো গান গাইতেন রাঙাদি। যেহেতু আমি তবলা বাজাতাম। সেজন্য, রাঙাদির বাড়িতে প্রবেশ ছিল অবাধ।

কথায় বলে অতি-সুন্দরী না পায় বর — রাঙাদির স্বামী বিয়ের অল্প দিনের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই রাঙাদি যেন কেমন হয়ে গেলেন, কোন কিছুর ওপর তার টান যেন কমে যেতে লাগলো। রাঙাদির দিদির বিয়ে হয়েছিলো চন্দননগরে। দিদির সেজ ছেলে ও ছেলের বৌ তাদের মা এর অভাব পূরণের জন্য রাঙাদিকে তাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো। তারা রাঙাদির সর্বস্ব হাতিয়ে একদিন বেড়াতে যাবার নাম করে এই হোমে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলো — তারপর থেকে রাঙাদি এই হোমের বাসিন্দা।

রাঙাদির টানে প্রায় রোজই হোমে আসতাম। যেহেতু রাঙাদি আমাকে স্নেহ করতেন, সেই দেখে হোমের অন্যান্য বৃদ্ধাদের নানান ফাই ফরমাস খেটে দিতাম।

মাঝে আমার এক আত্মীয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য দিন পনের হোমে যেতে পারিনি। সেদিন গিয়ে দেখি হুইল চেয়ারটাও নেই, রাঙাদিও নেই — বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

আমাকে এদিক ওদিক করতে দেখে একজন আবাসিক ইশারায় একটা ঘরের দিকে দেখাল। ছুটে গিয়ে দেখি রাঙাদি বিছানায় শুয়ে, কোমর থেকে প্লাস্টার করা। আমাকে দেখেই ইশারায় পাশে বসতে বলেন। জিজ্ঞাসা করি — কেমন করে হোল ? রাঙাদি খুবই ক্ষীণ স্বরে বলেন, রাতে খুব বাথরুম পেয়েছিল, জানিস তো এ বয়সে দেরী সহ্য হয় না.........একজন সেবিকাকে বার বার বলাতে, বিরক্ত হয়েই হুইল চেয়ারটা জোরে বাথরুমে ঠেলে দিলো — বললো — থাকো, বাথরুমে। আমি তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। প্রায় সারা রাতই বাথরুমে পড়ে ছিলাম, ওঠার শক্তি ছিলো না। ভোরের দিকে একজন খবর দেয়....ডাক্তার আসে.....তারপর তো দেখছিস। পড়েই আছি......কেউ গ্রাহ্যও করে না। .....আর সহ্য করতে পারছি না....বলে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। বললেন, প্রতাপ তুই তো আমাকে ভালোবাসিস, একটা কথা বলি, আমাকে তুই এখান

থেকে নিয়ে চল....আর পারছি না।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। খানিকক্ষণ পর সত্যি কথা বলতে, পালিয়ে এলাম। তারপর আর ওদিকে যেতে পারিনি।

বিসর্জনের বাজনা

দুর্গাপুজো এসে গেল। মহালয়ার এক সপ্তাহ আগে এক রবিবারের সকালে পাড়ার দুর্গা পূজা কমিটির ছেলেরা যখন পূজার নির্ঘন্ট দেওয়া আমন্ত্রণ পত্রটা শিউলীর হাতে দিয়ে গেল, তাতে এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়েই ছোট্ট শিশুর মত দু'হাতে তালি দিয়ে আনন্দে নেচে উঠল। হঠাৎ তালির আওয়াজ পেয়ে শ্যামল পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে শিউলীর কাছে এসে বলল—

— কি ব্যাপার ? হঠাৎ এত পুলক জাগল কেন ?

— পুলক জাগবারই তো কথা। এবার নবমী, দশমী একদিনে পড়েছে। মার বিসর্জনের বাজনা একদিন আগেই বেজে যাবে। জান, আমার আর তর সইছে না। মনে হচ্ছে আজকে বিসর্জন হলেই ভালো হ'ত। খুব আনন্দ হ'ত।

শ্যামল অবাক বিস্ময়ে শিউলীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘোর কাটতে বলল,

— তুমি তো দেখছি সাধারণের থেকে আলাদা। সমস্ত বাঙালীরাই চায় দশমী যত দেরীতে হয় তত ভালো। মাকে কেউ ছাড়তে চায় না। বিসর্জনের ঢাকের আওয়াজের সেই বোল — ''ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন'' মন থেকে নিতে পারে না। ঢাকের সেই আওয়াজ খুব মর্মস্পর্শী, বেদনাদায়ক। আর তোমার কিনা বিজয়া একদিন আগে হচ্ছে বলে আনন্দ হচ্ছে ? মনে পুলক জাগছে ?

শিউলী খুব সলজ্জ হেসে বলল,

— তোমার মা বুড়ী হয়ে গেল, কিন্তু এখনও প্রায় নিরোগ শরীর। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আরও বেশ কিছুদিন বাঁচবে। আমাব আর দেরী সহ্য হচ্ছে না। কবে ঐ বুড়ীটার বিসর্জনের বাজনা বাজবে তাই সবসময় ভাবি। ঐ বুড়ী মরলেই এই বাড়ি, গয়না, সম্পত্তি সব আমার হবে। নিজের খেয়াল খুশী মত যেখানে খুশী যেতে হয় যাব, যা পরতে ইচ্ছে হয় পরব। তখন আমি স্বাধীন। এই পরাধীনতা আর সহ্য হচ্ছে না। তোমার মা সবসময় আমার পিছনে লাগে। ম্যাক্সি পরলেই বলবে-তুমি ঘরের লক্ষ্মী, শাড়ী পরে থাক। হাতের শাঁখা, পলা খুলে রাখলেই রে রে করে ছুটে আসে, বলে, — স্ত্রী মানুষ, শাঁখা, পলা, নোয়া (হাতের লোহার চুড়ি) খুলতে নেই। সিঁদুর না পরলেই দৌড়ে এসে বলে, ছিঃ ছিঃ, সিঁদুর পর, নইলে তোমার স্বামীর অকল্যাণ হবে। আরে বাবা, যত সব কুসংস্কার। বিদেশিনী

মহিলারা যে হাতে শাঁখা, পলা, লোহা, সিঁদুর পরে না তাতে কি তাদের স্বামীরা মরে যাচ্ছে ? যখন যে মরবার সে মরবে। কোন মানুষই অমর নয়।

— শিউলী, বিদেশি মেয়েদের স্বামী মরে না, পাল্টে যায়। যার যত খুশী বিয়ে করে।

— সেটাই তো ভালো। আমাদের যেমন একশাড়ী বেশী দিন পরতে ভালো লাগে না, নিত্য নতুন ডিজাইন পছন্দ করি, সেরকম এক স্বামীর সঙ্গে আজীবন থাকতে হবে এটাও খুব বাজে ব্যাপার। অন্যায়, একঘেয়ে জীবন, অসহ্য।

শ্যামল ওর স্ত্রীর চিন্তাভাবনার সঙ্গে সহমত পোষণ না করলেও অশান্তির ভয়ে কিছু বলতে পারল না। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাপুজো এসে গেল। ক'দিন খুব হৈ চৈ। পাড়ার লোকেদের বাড়ির রান্না বন্ধ। সকালে রাত্রে সবাই পুজো প্যাণ্ডেলে খাওয়া দাওয়া করছে।

দশমীর সন্ধ্যায় বিসর্জনের ঢাকের বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ''বল হরি হরি বোল'' আওয়াজ তুলে একটা শববাহী গাড়ীর পিছনে এক ম্যাটাডোর ভর্তি লোক পাড়া থেকে বেরিয়ে গেল।

শিউলী চলে গেল। মাকে সিঁদুর পরাবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সেরিব্রাল স্ট্রোক।

বিসর্জনেব বাজনার মধ্যে দিয়ে মা চলেছেন। শিউলী চলে গেল মা'র বিসর্জনের বাজনার আগেই........।

রাতের অতিথি

আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগের ঘটনা। বাবার সঙ্গে রাত ৯টা নাগাদ দিদির বাড়ি রিক্সা করে যাচ্ছি। চারদিকে ঝোপঝাড়, জঙ্গল। ঝিঁ ঝিঁ পোকা একঘেয়ে ডাক্‌ছে। চাম্‌চিকি ও বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। সামনেই অমাবস্যা। গা ছম্‌ছম্‌ করা পরিবেশ। মোরাম বিছানো সরু রাস্তা। রাস্তার আলোগুলোও যেন টিমটিম করে জ্বলছে। ঐ আলো জ্বালার চেয়ে নিভে থাকলে বোধহয় ভাল হত। বাবাকে বলছি - ''জানো বাবা, আমি বেশ কিছুদিন আগে এই শিবমন্দিরটার কাছেই দেখেছিলুম।'' গ্রামের পুরোনো রিক্সাওয়াল ঐ কথা শুনে বল্‌ল - কি গো খোকাবাবু, কি দেখেছিলে? একটা সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া লোক ঐ মন্দিরটার পাশে বড় নর্দমার মধ্যে ঢুকে গেল ? বিস্ময়ে হতবাক। ঘোর কাটলে চম্‌কে উঠে বলি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছো। জানো খোকাবাবু, আমরা তো রাত বিরেতে এখান দিয়ে যাই। মাঝে মধ্যেই দেখি। ওনারা অপদেবতা। ভয় নেই। ওনারা কখনও ক্ষতি করেন না। ওনারা রাতেব অতিথি.......... ।

রহস্য কাহিনী

শিকড়ের টান

দিল্লি থেকে হাওড়ায় ফিরছিল সৃজন ও সতী, হনিমুন কাটিয়ে। বিয়ের পরেই সৃজন পরিকল্পনা করে আগ্রায় তাজমহলের কাছেই হোটেল বুক্ করেছিল যাতে সেই হোটেলের ঘর থেকে তাজমহল দেখা যায়। পূর্ণিমার রাত্রে আগ্রার তাজমহলের ওপর চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর মায়াজালে মধুচন্দ্রিমা যাপন করার লোভ ওরা সামলাতে পারেনি।

ছোটবেলায় বাংলাদেশ থেকে সতী যখন গুয়াহাটি হয়ে তার বাবা-মা, ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসছিল তখন আসাম মেল থেকে ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট ভাইকে কারা রাত্রে ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়েছিল। সেটা ওরা জানতে পারল, সকালে ঘুম ভাঙার পর। অনেক খোঁজার পরও তার সন্ধান পেল না। বাবা, মা অনেক চেষ্টা করেছিলেন পুলিশে, দৈনিক সংবাদপত্রে ও রেডিওতে ঘোষণা করেও কোন ফল পাওয়া গেল না।

কলকাতা নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, চেনা লোকেরও অভাব। দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করতেই সতীর বাবার সময় চলে যেত। কিন্তু এত চরম অসুবিধার মধ্যেও সন্তানের বিচ্ছেদ প্রতিটা সময় দগ্ধ করে দিত.........।

যথাসাধ্য চেষ্টা করে সতীকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। সতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে রসায়ণ শাস্ত্রে এম.এস.সি. পাশ করে একটি নামকরা স্কুলের শিক্ষিকা। কলেজে অধ্যাপনা করার জন্য চেষ্টা করছে।

সতীর দু'মাস হলো বিয়ে হয়েছে। স্বামীও সুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত ব্যাঙ্ক অফিসার। দু'জনের সুখের সংসার। ওর শ্বশুর মশায়, শাশুড়ী মা বর্ধমানে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। ওরা মাঝে মাঝে ওখানেও বেড়াতে যায়। কোলকাতায় ব্যাঙ্কের লিজ নেওয়া দু'কামরার ফ্ল্যাটে সতীরা থাকে। সতী নিয়ত তার ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের চিন্তা করে। ভাই এখনও বেঁচে আছে কিনা, থাকলে তার কেমন চেহারা, সে ব্যবসা করে না চাকরী, আদৌ তার সঙ্গে সতীর দেখা হবে কিনা, এতদিনের অদর্শনে তাকেও, অথবা, ওর ভাই চিনতেই পারবে না, এইসব অবাস্তব চিন্তা করে সতী। কিছুতেই ভাইয়ের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

দিল্লি থেকে বিকাল ৪-৩০ মিনিট নাগাদ ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের রিজার্ভ করা নির্দিষ্ট কামরায় উঠেই স্যুটকেশগুলো সিটের তলায় সৃজন চেন দিয়ে বেঁধে, তালা লাগিয়ে নিশ্চিন্তে

আয়াস করে বসে সতীকে বলল — কি চলবে ? চা না কফি ?

— কফি।

— তবে তাই হোক ।

প্যান্ট্রিকার থেকে একটি ট্রেতে দু'টো কাপ আর ছোট ফ্লাস্কে করে গরম কফি বেয়ারা দিয়ে গেল । সতী হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বিস্কুট বার করে সৃজনকে দিতে যাবার সময় লক্ষ করল — উল্টো দিকের সিটে বসা ২৩/২৪ বছর বয়সের একটি যুবক ইংরাজী পত্রিকা পড়ার ফাঁকে চশমার ভেতর দিয়ে তাদের লক্ষ করছে । ছেলেটি ফর্সা, সুদর্শন, সুঠাম চেহারা, চোখে আধুনিক সোনালী ফ্রেমের চশমা, গলায় মোটা সোনার চেন, ডান হাতে সোনার রিস্টচেন, বাঁ হাতে দামি ঘড়ি । ছেলেটির মুখে সুন্দর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি । মানিয়েছে ভাল । ওকে দেখে সতীর ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ল । ছেলেটিকে ভদ্রতার খাতিরে সতী বলল — কফি খাবেন ? ছেলেটি মুচ্‌কি হেসে বলল — নো, থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর অফার । সতী আর কথা না বাড়িয়ে সৃজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে কফি খেতে লাগল । আগামীকাল দুপুর একটায় ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছবে । অতক্ষণ সময় কিভাবে কাটাবে সেই চিন্তাতেই সতী মগ্ন ।

বেশীক্ষণ বই পড়তে বা কাগজ পড়তে সতীর ভাল লাগেনা । ছোটবেলায় ছিন্নমূল হয়ে এপাব বাংলায় আসার সময় ঐ বয়সেই সে বুঝেছিল ভালো করে পড়াশুনা না করলে জীবনে মান, সম্মান, টাকা, পয়সা কিছুই পাওয়া সম্ভব নয় । ও দিনে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৭/১৮ ঘন্টা পড়াশুনাতেই ডুবে থাকত । পড়াশুনা ছাড়া অন্য কোন দিকে সে মন দিত না । নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই চিন্তাতেই সে মন দিয়ে পড়াশুনা করত । সাজপোষাকের দিকে কোন খেয়াল রাখত না । এখন বিয়ের পরে তার পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না, গায়ে জ্বর আসে ।

সতী ব্যাগ থেকে ফটো অ্যালবাম বার করে দেখতে লাগল । ছোটবেলার সাদা-কালো ছবিগুলো লালচে হয়ে গেছে । সৃজন বললো — কি অত ছবি দেখছ মন দিয়ে ?

— আমার ছোটবেলায় হারিয়ে যাওয়া জীবনের ছবি । এই দ্যাখ, আমার বাবা, মা, আমি আর আমার হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট ভাই । ময়মনসিংহে আমাদের বাড়ির সামনে সুপারী বাগানে তোলা ছবি । এই কথা বলে সিটের ওপর অ্যালবামটা রেখে দু'জনের মুখোমুখি বসে ছবি দেখতে লাগল আর সতী স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে বাংলাদেশের যুদ্ধের স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে উঠল । পাকিস্তানী সেনা ও রাজাকার গুণ্ডারা ঐরকম অমানুষিক

অত্যাচার না করলে তাদের এপারে আসাই হত না। সতী দেখল অধীর আগ্রহে ছেলেটি মনযোগ দিয়ে দূর থেকে সতীর ছোটবেলার অ্যালবাম্ দেখছে। ছেলেটির সাথে চোখাচোখি হতেই ছেলেটি আগের মত ইংরাজী ম্যাগাজিন দিয়ে মুখটা আড়াল করল।

রাত্রে নটার পর খাওয়ার পাট সেরে সৃজন বড় আলোগুলো নিভিয়ে ছোট আলো জ্বেলে দিল। সতী নীচের বার্থে, সৃজন মাঝের বার্থে। ঐ ছেলেটিও উল্টো দিকের মাঝের বার্থে শুয়ে পড়েছে। সতী ও সৃজন যে যার বেড্ রোল খুলে শুয়ে পড়ল। সৃজন শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। তার নাক ডাকার আওয়াজ সতী শুনতে পাচ্ছে। সতীর ঘুম কিছুতেই আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ মাঝরাত্রে বিকট চিৎকার, চেঁচামিচি, কান্নার আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল — কামরার সকলেই উঠে পড়েছে একমাত্র ঐ ছেলেটি ছাড়া। সে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সতী খুব অবাক হয়ে চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখছে, এমন সময় সৃজন নীচু হয়ে মুখটা নামিয়ে ইশারায় সতীকে বলল — চুপচাপ শুয়ে থাকো চাদর মুড়ি দিয়ে। কামরায় ডাকাত পড়েছে, মহিলারা উচ্চৈস্বরে কাঁদছেন। ও দেখল ২০-২৫ বছরের মধ্যে বয়স এমন কয়েকটা ছেলে মুখে মাথায় কালো কাপড় দিয়ে কামরার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কারুর হাতে চপার, কারুর হাতে ওয়ান শটার পিস্তল। একজনের হাতে বন্দুক। ভয়ে ওর হাত পা ঠাণ্ডা হিম্ হয়ে গেল। হিম্ শীতল স্রোত মাথার পিছন থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

ও পরিষ্কার অনুভব করল পুরো কামরার যাত্রীদের কাছ থেকে ডাকাতরা জোর করে টাকা পয়সা, সোনার হার, দুল, চুড়ি, আঙটি, ঘড়ি ইত্যাদি ছিনিয়ে নিচ্ছে। কেউ এতটুকু বাধা দিতে পারছে না। রেল-পুলিশও কামরা থেকে উধাও। সরকার ট্রেনে সুরক্ষা ট্যাক্স কান ধরে আদায় করলেও যাত্রীদের সুরক্ষা দিতে অক্ষম। হৈ, হৈ, চিৎকার, কান্না হাহাকারের মাঝে হঠাৎ কয়েকটা ডাকাত এসে খুব সন্তর্পণে ঐ ছেলেটাকে আস্তে ডাক্‌ছে — সর্দার, কাম্ খতম। আভি এহি লোক বাকী হ্যায়। যার হাতে বন্দুক ছিল সে বন্দুকের নল দিয়ে সতীর মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে হিন্দিতে কর্কশস্বরে বললো — নিকালো যিত্‌না গোল্ড হ্যায় আপকে পাস। হামলোগ আভি উত্‌রেঙ্গে। দের করনেসে মার ডালুঙ্গা। উল্টোদিকে শুয়ে থাকা ছেলেটি বিদ্যুৎবেগে উঠে ডাকাতটার গালে সজোরে একটা চড়। ডাকাতটা হতভম্ব। সর্দার — মেরা কেয়া কসুর ?

— এ জানানা মেরা দিদি হ্যায়। চলো, উতারো আভি। ডাকাতদল চেন টেনে ট্রেন থেকে নেমে গেল সঙ্গে ঐ যুবকটিও............।

লালসা

উত্তরপ্রদেশের দেওড়িয়া জেলার মধ্যে নোনাপার গ্রাম খুব বর্ধিষ্ণু। প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। ক্ষেত জমি প্রায় সকলেরই আছে। সামান্য কয়েকঘর জন মজুরীতে ক্ষেতে কাজ করে। ব্যাঙ্ক, পোস্ট-অফিস, পঞ্চায়েত ভবন, স্কুল ইত্যাদি সবই আছে। খাওয়াপরার অভাব খুব একটা নেই কিন্তু কাঁচা টাকা-পয়সার একটু অসুবিধা আছে। জাতপাতের সমস্যায় ক্ষেতের ফসল রক্ষা করতে গিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। দু'চার জন মারা যায়, জখমও হয় অনেক। তবে গ্রামবাসীবা মনে করে গ্রামে থাকতে গেলে এভাবেই লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। এক সম্পন্ন চাষীব ছেলে রবীন্দর প্রসাদ সিং-এর গ্রামের ঝামেলা পছন্দ না হওয়ায় শান্তির খোঁজে কলকাতায় চলে আসে। প্রথমে বড়বাজার অঞ্চলে, একটা বড় ঘরে ছটা চৌকি আছে তার মধ্যে মাসে ষাট টাকা দিয়ে একটা চৌকি ভাড়া কবল, বাথরুম কমন। বাড়িটার চারদিকে ঘর, মাঝখানে খোলা উঠোন। সেখানে বড় চৌবাচ্চা আর চাবদিকে মোট ছটা কল, স্নান কবা, জল ভরাব জন্য। বাড়ির বাইরে কলকাতা কর্পোরেশনের টিউবওয়েল, সেখান থেকে কলকাতার বস্তি এলাকার লোকজন জল নেয়। ভালই দিন কাটছিল। রবীন্দর বিভিন্নবকম অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করত। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নিজের দোকান কবার স্বপ্ন সফল হ'ল। মৌলালীতে আট ফুট বাই দশ ফুটের একটা দোকান ঘর পঁচিশ বছরের লিজে নিয়ে মোটর পার্টসের দোকান খুলল। রাস্তার ওপরেই দোকান। ক্রমে ক্রমেই পশার বাড়তে লাগল। চেহারায় জৌলুস ফিরল। অনেকদিন বাদে গ্রাম থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম এল — "মায়ের অসুখ তাড়াতাড়ি চলে এস।" গ্রামে এসে দেখে মা কেঁদে কেঁদে অসুস্থ হয়ে গেছে কারণ মার ইচ্ছা রবীন্দরের ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দেয়। পাশের মাঝৌলিবাজ গ্রামের বড় জোতদারের মেয়ে মঞ্জু সিং। দেখতে শুনতে ভাল। মাধ্যমিক পাশ। ঘরের কাজকর্ম জানে। লম্বাও আছে। রবীন্দরের সঙ্গে মানাবে ভাল। নগদ তিন লাখ টাকা, বরাতীর খরচ এক লাখ সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ ভরি গয়না সোনা-রূপো মিলিয়ে। মেয়ের বাড়ি বাবা, কাকা, জ্যাঠা মিলিয়ে যৌথ পরিবার। মেয়ের ঠাকুর্দা এখনও জীবিত। একশ বিঘা জমি, সেটা পাহারা দেওয়ার জন্য গোটা পঁচিশ দো-নলা বন্দুকও আছে। রবীন্দরের বাড়িতেও প্রায় কুড়িখানা দো-নলা বন্দুক আছে। দুই বাড়ি মিলিয়ে যা বন্দুক আছে তা দিয়ে রবীন্দরদের বাড়ি, ক্ষেত ইত্যাদি ভালোই পাহারা দেওয়া যায়। গ্রামে যার যত বন্দুক তার তত জোব। পঞ্চায়েত নির্বাচনে

তারাই প্রাধান্য পায়। যাইহোক, খুব ধুমধাম করে মঞ্জু সিং-এর সঙ্গে রবীন্দরের বিয়ে হয়ে গেল। বরাতীতে হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদিকে সাজিয়ে ইংলিশ ব্যাণ্ডের বাজনাসহ রবীন্দর বিয়ে করতে গেল। সারা গ্রামের লোক বলতে লাগল এত বড় বরাতীর মিছিল গ্রামে আগে কেউ কখনও দেখেনি।

বিয়ের বছরখানেক বাদে লেকটাউন অঞ্চলে ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলায় দুই কামরার ঘর ভাড়া নিয়ে দেশ থেকে স্ত্রী মঞ্জু ও ছোটভাই সতীন্দর প্রসাদ সিং-কে নিয়ে এল। সারাদিন রবীন্দর ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকে। সেইজন্য ছোটভাইকে নিয়ে এল কলকাতায় পড়াশোনা করবে, তার সঙ্গে বাড়ীর দোকান বাজার করতে বৌদিকে সাহায্য করবে। নতুন বাসা ভাড়া নিয়েছে, খরচও বেড়ে গেছে। আগে একা থাকত, যাহোক করে চলে যেত কিন্তু নতুন বউ এবং ভাইয়ের খরচ আছে, ফলে আরও রোজগার দরকার। সারাদিনই ব্যবসার কাজে ব্যস্ত। বাড়ির দিকে তাকাবার সময় নেই। শনিবার বিকেল আর রবিবার সারাদিনই দোকান বন্ধ থাকে। তখন একটু ফুরসৎ মেলে বাড়িতে থাকার ও স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা, থিয়েটার বা অন্য কোথাও বেড়াতে যাওয়ার। অন্যান্য দিনে রাতে ক্লান্ত শরীরটাকে কোনমতে টেনে হিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে এসে যা হোক করে দুটো খেয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে উঠে স্নান-পুজো-নাস্তা সেরে দোকানের পথে বেরিয়ে পড়ে। মঞ্জু দরজা অবধি এগিয়ে যায়, রবীন্দরকে হাত নাড়িয়ে টা টা করে। কলকাতায় এসে মঞ্জু এটা শিখেছে। এইভাবেই দিন কাটছে। সতীন্দর বৌদির ফাইফরমাস খাটে আর কলেজের পড়া করে। বৌদি রবীন্দরকে না পেয়ে সতীন্দরের সঙ্গেই গল্পগুজব করে দিন কাটায়। সতীন্দরও বৌদি ছাড়া থাকতে পারে না। বৌদি ওর চেয়ে বছরখানেকের বড়। বন্ধুর মতোই ব্যবহার তাদের দুজনের মধ্যে।

ইতোমধ্যে সতীন্দর কলেজের পাঠ শেষ করে দাদার ব্যবসায় সাহায্য করতে দোকানে বেরোচ্ছে। যাবার সময় বাসস্ট্যাণ্ডে একটি মেয়েকে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কলেজ যাওয়ার জন্য। মেয়েটিরও ভাল লাগে তাকে। ক্রমে পরিচয় হয়। মেয়েটি অবাঙালি, ওর বাবাও পাটনা থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছে। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে বড়বাজারে ওর বাবা কাজ করে। সতীন্দর ওকে নিয়ে ইতোমধ্যেই শ্যামবাজারে একটা সিনেমাও দেখেছে। প্রেম ক্রমশ জমে উঠেছে। হঠাৎ একদিন শরীরটা খারাপ হওয়ায় কাজে বেরোয়নি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সতীন্দর গায়ে একটা পাতলা চাদর দিয়ে শুয়ে পড়েছে। তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় মঞ্জুর হাতের স্পর্শে তার তন্দ্রা ভেঙে যায়। মঞ্জু ওর পাশে শুয়ে

মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ মঞ্জু বলে — 'তোমাকে আজকাল যেন কেমন একটু অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে, আগের মত আমাকে সব কথা বলছ না, চেপে যাচ্ছ।' -কি করে বুঝলে ? আমি সব বুঝতে পারি। বিয়ের পরে তোমার দাদাকে যত না কাছে পেয়েছি তার চেয়ে তোমাকে বেশি। অনেক কায়দা করে মঞ্জু জানতে পারে বিহারী একটা মেয়েকে সতীন্দর ভালবাসতে শুরু করেছে। মঞ্জু ভয় পায়। হারাবার ভয়। মঞ্জু ভাবতে শুরু করে সতীন্দর নিজে পছন্দ করে বিয়ে করলে, দেশে ওর শ্বশুর খুব গোঁড়া রাজপুত-সতীন্দরকে বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। ওর দাদার দোকানে না বসে হয়তো ওর শ্বশুরের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীতে কাজে লেগে যেতে পারে কিংবা ওদের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে না থেকে অন্য কোথাও বাসা ভাড়া করে চলে যেতে পারে। ফলে ওদের দোকানেরও ক্ষতি হতে পারে। নিজেরও যা ক্ষতি হবে সেটা রবীন্দরকেও বলতে পারবে না। মঞ্জু মনে মনে ক'দিন ধরেই ভাবছিল, ওর ছোট বোনের সঙ্গে সতীন্দরের বিয়ে দেবে। ফলে ওদের রোজগার ভাগ হবে না, নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এইসব ভাবতে ভাবতে মঞ্জু সতীন্দরকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা হাতে দুধের জায়গা নিয়ে অনেকে মর্ণিং-ওয়াক করতে বেরিয়েছে। পার্কের পাশে বড় পুকুর আছে, তার ঘাটের কাছে দুধের ডিপো। পার্কে যারা বেড়াতে আসে বেশিবভাগ মানুষই পুকুরের চারিদিকে অন্ততঃপক্ষে একপাক ঘুরে দুধ নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে বসে একটু গল্পগুজব করে যে যার বাড়ির পথ ধরে। ঘাটের কাছে খুব ভিড়। একটা যুবকের লাশ ভেসে উঠেছে। ছিটের আণ্ডারওয়্যার পরা। খালি গা। জনতা যারা দাঁড়িয়েছিল যে যার মনোমত মন্তব্য করছে। একটু বেলা বাড়তে পুলিও এল, একজন এ.এস.আই. সঙ্গে দুটো সেপাই। সেপাই দুটো একটা বড় বাঁশ জোগাড় করে, বাঁশ দিয়ে টেনে টেনে লাশটাকে ঘাটের কাছে এনে টেনে তুলল। ঘাটের চওড়া সিঁড়িতে লাশটাকে শোওয়াবার পর লেকটাউন থানার এ.এস.আই. সুরঞ্জন বিশ্বাস সেপাইদুটোকে নির্দেশ দিল-সমস্ত ভিড় সরিয়ে দাও লাশের কাছ থেকে। ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। সুরঞ্জন বাবু লাশটাকে উল্টেপাল্টে পরীক্ষার করার পর বলল — লাশটার কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই, শুধু কানের পাশটায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে — ইনটারনাল হেমারেজ। প্রথমত, লাশটা অবাঙালীর কারণ, ছিটের রঙীন আণ্ডারপ্যান্ট বাঙালীরা পরে না। দ্বিতীয়তঃ হাতে মহাদেবের ত্রিশূলের উল্কি। উড়িষ্যাবাসীরাও হাতে উল্কি করে, কিন্তু সেটা জগন্নাথ দেবের। শিবঠাকুরের নয়। সাধারনতঃ বেনারসের কাছাকাছি বসবাস করে এমন লোকেরাই হাতে

শিবের ত্রিশূল-এর উল্কি করে। এ.এস.আই. সুরঞ্জন বিশ্বাস তাড়াতাড়ি লেকটাউন থানায় ফোন করে লেকটাউন থেকে যশোর রোড ও ভি.আই.পি. (কাজী নজরুল সরণী) রোডের বেরবার রাস্তা বন্ধ করে দিল। কোন অবাঙালী পরিবার যেন লেকটাউন থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। এরপর একটা মাইক নিয়ে হিন্দিভাষী একটা সেপাইকে রিক্সা করে প্রচারে পাঠাল — এলাকার সব অবাঙালী পরিবার এবং ফ্ল্যাটের কেয়ার-টেকাররা যেন দয়া করে দুধের ডিপোর পাশে পুকুরের ধারে এসে লাশটাকে সনাক্ত করতে পুলিশকে সাহায্য করে। যত অবাঙালী পরিবার ছিল সকলেই পুকুরের পাড়ে এল, এমনকি রবীন্দর ও মঞ্জুও। কেউ চিনতে পারল না। এমন সময় ওদের ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার এসে বলল — স্যার ও লাশটা যার, সে আমাদের ফ্ল্যাটেই থাকত বলে মনে হচ্ছে। তখন পুলিশমর্গে বিশ্বাসবাবু লাশটাকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে থানার ও.সি.-কে নিয়ে রবীন্দরের ফ্ল্যাটে গেল জিজ্ঞাসাবাদ করতে। রবীন্দরের বাড়ীতে কলিং বেল বাজতেই মঞ্জু এসে দরজা খুলে বলল — কি চাই? আমরা থানা থেকে আসছি। আপনার স্বামী কোথায়? ঘরে আর কে কে আছে? রবীন্দর শোয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অফিসারদের চেয়ারে বসতে দিল। বলুন স্যার কি জানতে চান? আপনার বাড়ীতে কে কে থাকনে? আমি রবীন্দরপ্রসাদ সিং ও আমার স্ত্রী মঞ্জু দেবী। আপনাদের ছেলেমেয়ে নেই? না স্যার, সবে দু'বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে। তখন ও.সি. ও সুরঞ্জন বাবু ঐ ফ্ল্যাটের কেয়ার টেকারকে জিজ্ঞেস করলেন - তুমি কিছুক্ষণ আগে যে লাশটা সনাক্ত করলে সে কি এই ফ্ল্যাটেই থাকত? হ্যাঁ স্যার। রবীন্দরজী আপনাদের বাড়ীতে যে ছেলেটি থাকত কেয়ারটেকার বলছে, সে কে? ও স্যার ভুল বলছে। আমরা দু'জন ছাড়া কেউ থাকি না। ও.সি. বললেন — ঠিক আছে, আপনি কি করেন? ব্যবসা করি মোটর পার্টসের, মৌলালীতে নিজেদের দোকান আছে। দোকানের ঠিকানা দিন। আপনাদের দেশের বাড়ী কোথায়, কে কে আছেন সমস্ত একটা কাগজে লিখে সই করে দিন। বিশ্বাসবাবুদের সঙ্গে আনা ফটোগ্রাফারকে দিয়ে রবীন্দর, মঞ্জু সিং-এর ফ্ল্যাটের ঘরের ছবি, তাদের দুজনের ছবি ও হাতের আঙুলের ছাপ তুলে নিয়ে লেকটাউন থানায় ফিরে গেল। যাওয়ার সময় ও.সি. বললেন, আমাদের না জানিয়ে লেকটাউনের বাইরে রাত্রিবাস করবেন না।

দিন দশপনেরো পরে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর রবীন্দরদের ফ্ল্যাটে মেয়ে পুলিশসহ হানা দিল পুলিশ। ওয়ারেন্ট দেখিয়ে থানায় রবীন্দর ও মঞ্জু সিং-কে ধরে আনল। তারপর চলতে লাগল জেরা। লালবাজার মার্ডার স্কোয়াডের ও.সি. মিঃ তপন গুপ্ত তার

সঙ্গীদের নিয়ে জেরা করতে এলেন। সারারাত ধরে জেরা কবার পর রবীন্দর ভেঙে পড়ল। হ্যাঁ স্যার, যে লাশটা পুকুরে ভেসে উঠেছিল, সেটা আমার ভাই সতীন্দব-এর। কি করে মরে গেল জানিনা। যেদিন ওর লাশ ভেসে ওঠে তার আগের দিন রাতে মঞ্জু এসে বলল — হঠাৎ বাবু ভাইয়া মারা গেছে। কোথায় কি খেয়ে ছিল, রাত্রে বাড়ী ফিরে বমি করে। তারপরেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি ডাক্তার আনার কথা বলতেই ও কারণ করলো, বললো — না, না ওসব ঝামেলা করে লাভ নেই, তারচেয়ে চলো আমাদের ফ্ল্যাটের কাছে পুকুরে ফেলে দিয়ে আসি, কেউ জানতেও পারবে না। ডাক্তার ডাকলেই সে পুলিশকে খবর দেবে, হাজার ঝামেলা। দেশের বাড়ির সবাই বলবে, তোমার কাছে এসে ভাই মারা গেল, বদনাম হবে। অগত্যা স্যাব আমরা ভয় পেয়ে, নাইট গার্ডরা রাত দুটো নাগাদ ঘুমিয়ে থাকার সময় ঐ ঠাণ্ডায় ভাইয়ের লাশ পুকুরে ফেলে আসি। কিন্তু কি করে ভাই মারা গেল সেটা জানিনা। গম্ভীরভাবে সুরঞ্জনবাবু বললেন — যখন লাশটাকে পুকুর থেকে তুলি তখনই পরীক্ষাব সময় চোখে পড়ে, তার কান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে জমাট বেঁধে আছে। পুকুরেব জলে একটু গললেও পুরোটা গলে নি। তার মানে মারা যাবার বেশ কিছুক্ষণ পব রক্ত জমাট হয়ে গেলে পুকুরে ফেলা হয়। দ্বিতীয়ত দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও মুখে একটা সুতোর টুকরো দাঁতের ফাঁকে আটকে ছিল। সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে মেয়েদের কাপড়ের সুতো। তৃতীয়তঃ, অণ্ডকোষ আস্বাভাবিকভাবে ফুলে উঠেছিল, যেটা জলে ডুবে থাকলেও অতটা ফোলেনা। মঞ্জু সিং-কে থানায় ধবে আনার পর ঐ সুতোর টুকরোব খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি বাথরুমের মাথার চোরা কুঠরীতে একটা কালো ব্যাগের মধ্যে নানা পুরোনো খববের কাগজ, ছেঁড়া শাড়ির বাণ্ডিলের মধ্যে নির্দিষ্ট শাড়িটা রয়েছে। কিন্তু যতবারই মঞ্জু সিং-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ততবারই সে অস্বীকার করেছে। ওদের ফ্ল্যাটের ঘরে গিয়ে দু-ঘরে দুটো বিছানা কার জিজ্ঞাসা করায় ও বলেছে একটায় তারা স্বামী-স্ত্রী শোয় অন্যটায় আত্মীয়স্বজন কেউ এলে শোয়। কিন্তু দুটো বিছানাই তদন্তের দিন অবিন্যস্ত ছিল, তার মানে দুটো বিছানাতেই লোক শুয়েছিল। মার্ডার স্কোয়াডের দুঁদে অফিসাবদের জেরাতেও মঞ্জু দেবী ভেঙে পড়েনি। মঞ্জুদেবীই তার দেওরকে রাতে খাওয়ার সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল যাতে সে খাওয়ার পরেই ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর তার মুখে কাপড় গুঁজে অণ্ডকোষ দুটো গায়ের জোরে চেপে ধরেছিল যতক্ষণ না তার দেওরের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হয়। আদালতে মাননীয় জজ সাহেবের নির্দেশে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্য মঞ্জুদেবীর আজীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও তার স্বামীর, খুনের প্রমাণলোপের অভিযোগে তিন বছর কারাদণ্ড হয়।

মিষ্টিমুখ

(১)

সুশোভনবাবু খুবই ভদ্র, শিক্ষিত সরকারি চাকুরে। ছোটবেলায় তাঁর বাবা নর্থ ফ্রন্টইয়ার রেলওয়েতে বিভিন্ন স্টেশনে স্টেশন মাস্টার ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর বদলীর চাকরী। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলেই সুশোভন বাবুর স্কুলের পড়াশোন। ফুটবল খেলার খুব নেশা ছিল। স্কুল থেকে ফিরে কোনরকমে হাত, মুখ ধুয়ে খানিকটা ভাত আলু সেদ্ধ দিয়ে খেয়েই দৌড়ে খেলার মাঠ। সেখানে বল নিয়ে ছোটাছুটি, দাপাদাপি বন্ধুদের সঙ্গে। সন্ধের একটু আগেই রণক্লান্ত সৈনিকের মত বিদ্ধস্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরা। আবার একপ্রস্থ মুখ, হাত, পা ধুয়ে জামাকাপড় পাল্টে পড়তে বসা। ইতোমধ্যে তাঁর মা, সান্ধ্যপ্রদীপ দিয়ে ঠাকুরঘরে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে পূজো করতে বসেন। পূজাপাঠ সেরে গরম এক গ্লাস দুধ ও দুটো বিস্কুট নিয়ে আসেন ছেলের ঘুম তাড়ানোর জন্য। ঘরে ঢুকেই দেখেন রোজকার মতো সুশোভন বাবু সুর করে ঢুলে ঢুলে পড়ছেন। —"ওরে খোকা, অনেক পড়েছিস, এবার দুধটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দে। রাত্রের রান্না এখনও বাকী।" দুধটা খেয়ে ঘুমটাও ছাড়ল, পড়ার জন্য দেহে একটু বলও বাড়ল। খানিক পরেই ওঁর বাবা ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরবেন। তখন খোকাকে ঘুমোতে দেখলে আর রক্ষা নেই। ভয়ে সুশোভন বাবুর মা আগেই ছেলেকে ঘুম তাড়ানোর জন্য দুধ খাইয়ে দেন। বাবা খানিক পরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে পাক্কা এক ঘণ্টা ছেলেকে অঙ্ক কষান। খুবই বিরক্ত লাগে, বিকেলে অত ফুটবল খেলার ক্লান্তি কাটিয়ে অঙ্ক কষা। সোজা অঙ্কও তখন কঠিন মনে হয়। তারপর ইংরাজী ভালো করে না পড়লে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাবার কাছে অঙ্ক কষা ভবিষ্যতে খুবই কাজে দিয়েছে। সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রথম বারেই সসম্মানে উত্তীর্ণ। বেকারত্বের জ্বালা পোহাতে হয় নি। বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। মাধ্যমিক প্রথম বিভাগে পাশ করার পর, শিলিগুড়ি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক, পরে অঙ্কে অনার্স নিয়ে সেখান থেকেই প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। বাবার বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে এম.এস.সি. পাশ না করেই রেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হিসাবে যোগদান করলে। ইতোমধ্যে বাবা অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসরকালীন টাকা পয়সা দিয়ে বেলঘরিয়া স্টেশনের পাশে দু'কাঠা জমি কিনে তাঁর বাবা উত্তরবঙ্গের পাট চুকিয়ে ছোট বাড়ি করলেন। মনে সাধ, এবার ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারের

ভার তার হাতে ছাড়বেন। সুশোভনবাবু কিছুতেই বিয়েতে রাজী হলেন না। তাঁর বাবা, মাকে বললেন — "এত কম মাইনেতে বিয়ে করতে ভরসা হয়না। বরং অফিসের ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষাগুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি অফিসার হয়ে নিই। তারপর বিয়ের চিন্তা তোমরা কোরো।" ক্রমশঃ দিন পেরিয়ে চলে। সুশোভন বাবুর চোখে চশমা উঠেছে। কানের পাশে চুলে পাক ধরেছে কিন্তু বিয়ে করাটা হয়ে উঠছে না। ইতোমধ্যে ছ-মাসের তফাতে বাবা, মা স্বর্গে চলে গেলেন। সেই খোকা আজ বড় একা, নিঃসঙ্গ। তার মুখে দুধের গ্লাস ধরার কেউ নেই। জোর করে অঙ্ক কষার জন্যও কেউ বকাবকি করবে না। এখন মনে হয় বকাবকির লোক থাকলে বোধহয় তার হাতে জীবনটা নিশ্চিন্তে সঁপে দেওয়া যেত।

(২)

এ অফিসে ভাইফোঁটার খুব চল আছে। সেদিন কাজের চেয়ে হৈচৈ, আনন্দ, খাওয়া দাওয়া, গল্পগুজবই বেশী। অফিসের পিওন থেকে বড়কর্ত্তা সকলেই সেই আনন্দের অংশীদার। মহিলা সহকর্মীরা পুরুষ সহকর্মী ভাইদের কপালে ফোঁটা দেয়, মিষ্টি খাওয়ায়। পুরুষকর্মীরা মহিলাদের জন্য ভাল শাড়ী উপহার দেয়। খুবই প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হঠাৎ সুমনা বলে — সুশোভনদা'র একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে দেওয়া উচিৎ। ওনার বাবা-মাও নেই, ভবিষ্যতে কে দেখাশোনা করবে? সুদীপা, বিজন, অনিমেষ সকলেই সুমনার কথায় হৈ হৈ কবে সুশোভন বাবুকে চেপে ধরল। সুশোভনদা বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, রিটায়ার করলে মুখে জল দেওয়ার কেউ থাকবে না। আপনার কোন নিকট আত্মীয়-স্বজনও এখানে নেই, যতদূর আমরা জানি। আপনার ভারটা আমাদের উপর ছেড়ে দিন, তাড়াতাড়ি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেব। সুশোভন বাবু যতই আপত্তি করেন ততই ওরা চেপে ধরে। বলেন, — ও'রে তোরা কি সব ভাইফোঁটার মিষ্টি খেয়ে পাগল হয়ে গেলি নাকি? আমার বয়স এখন পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই আর বুড়ো বয়সে চুলে পাক ধরেছে ও লাইনে আমি নেই। অনেক হয়েছে এবার তোরা কাজে বোস। অর্থ দপ্তরে কাজ করিস্ মনে থাকে যেন। বিপাশা বলে, তুমি দাদা বিয়ে না করে একেবারে বেরসিক হয়ে গেছ। খালি কাজ আর কাজ। একটু আনন্দও তো মাঝে মাঝে করতে হবে — নাহলে একঘেয়ে লাগবে।

সুদীপা, বিজন, অনিমেষ চুপি চুপি তথ্যকেন্দ্রে গিয়ে সুশোভন বাবুর বিয়ের জন্য বক্স নাম্বার নিয়ে বিজ্ঞাপন দিল। বিজ্ঞাপনের জবাবে বেশ কিছু চিঠিও এল ছবি সহ।

ওদের ধারণা ছিল মজা করে বিজ্ঞাপন দিলাম, হয়ত এত বয়সের পাত্র বলে পাত্রীর খোঁজ সেভাবে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু চিঠির বহর দেখে ওরা হতবাক। ক্যান্টিনে একটা মিনি অফিস খোলা হল, পাত্রী বাছাই করার জন্য। ওরই মধ্যে তিন-চার জনকে বাছাই করা হোল। সুশোভনদা নিজে সকালে উঠে রান্না করে খেয়ে অফিসে আসেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে আবার নিজেকে রান্না করে খেতে হয়। খুবই কষ্ট। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে সে যেন ভাল রান্না করতে পারে এটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ওরাই মেয়ে দেখে এবং তাদের হাতের রান্না খেয়ে একজনকে বাছাই করল। গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী দেখতে, চেহারা মাঝামাঝি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, সোনারপুরে বাড়ি। রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করে বিয়ে দিতে গিয়ে নিজের বিয়ে করাটা এত বয়সে এখনও হয়ে ওঠেনি।

অনিমেষরা সবাই মিলে হৈ হৈ করে ভাল দিন দেখে সুশোভনবাবুকে রেজিষ্ট্রি বিয়ে দিয়ে দিল। সুশোভনবাবু প্রথমে বিয়ে করতে খুবই আপত্তি করেন কিন্তু বিপাশা বোঝাতেই তিনিও ভাবলেন — সত্যিই তো, এত টাকা রোজগার করি, আমাকে এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেয়ে অফিস আসতে হয়। আর পারা যায় না। বয়সটাকে তো মানতে হবে। কম বয়সে যেটা জেদের বশে করা যেত এই বয়সে সত্যিই কষ্ট হয়। শরীরটা একটু বিশ্রাম চাইছে। অগত্যা ওদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হোল।

(৩)

আবার নতুন জীবনের শুরু হল। সুশোভন বাবুর স্ত্রীর নাম সোনালী। ওনার স্ত্রী রান্নায়, কাজে-কর্মে খুবই পটু। সুশোভন বাবুর ফর্সা, রোগা চেহারা একটু গোলগাল হ'ল। স্ত্রী নিয়মিত চুলে কলপ করে দেন। বেশ যত্ন করেন তাঁর শরীরের। অফিসের ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করে — "দেখলেন তো দাদা, কেমন চেহারার জৌলুস ফিরিয়ে দিয়েছি — সকলকে মাংস ভাত খাইয়ে দিন। বয়স তো দশ বছর কমে গেছে। কেউ বলবে না আপনার বয়স পঞ্চাশ বছর। জোর করে আমরা বিয়ে দিলুম বলেই তো হ'ল। এখন কেমন লাগছে?" — যা যা মেলা বাজে বকিস্ না, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন — এখনকার কাজ এখনই করতে হবে, ফেলে রাখা যাবে না। বিজন বলে, 'ছাড়ুন তো দাদা, ঐসব বস্তাপচা, পুরানো কথা। যেই নতুন গদীতে বসে, সেই বাণী দিতে শুরু করে। যেমন চলছে তেমনই চলবে। ওসব বাণী ভিজে ন্যাতার মত চুপসে গেছে। তিন বছর ডি-এর টাকা পাইনি। ওইসব কথা বলে আমাদের বোকা বানাতে পারবে না।' সুমনা ওর ব্যাগ

থেকে দুটো জগন্নাথ এক্সপ্রেসের পুরী যাওয়া-আসার ট্রেনের টিকিট বার করে সুশোভন বাবুকে বললে, 'যান-হানিমুন করে আসুন। আগামী শুক্রবার রাতের ট্রেনের টিকিট। শনি, রবিবার অফিস ছুটি। মঙ্গলবারও একটা ছুটি পড়েছে। সোমবারটা ক্যাজুয়াল নিলেই হল। বুধবার সকালে ফিরে অফিস করবেন। এটা আমাদের উপহার। আপনাকে যেতেই হবে।' অফিসের ছেলেমেয়েগুলো এত ভালোবাসে, নিজের ভাই-বোন হলেও বোধহয় এত ভালোবাসা পেতাম না, সুশোভনবাবুর মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে।

(৪)

সুশোভনবাবুকে ওনার স্ত্রী মোটা টাকার ইনসিওর করে দিয়েছে। উনি বল্লেন, 'এত টাকার ইনসিওর কেন করালে এই বুড়ো বয়সে?' বৌদি বল্লেন — 'আমি ইনসিওরের এজেন্সি করি, আর আমি জানবো না কোন বয়সে ইনসিওর করতে হবে?' হোল লাইফ পলিসি। মোটা টাকা বছরে ইনসিওরের প্রিমিয়াম। ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হোল। সেখানেও সুশোভন বাবু উত্তীর্ণ হলেন। সোনালী বৌদির স্বামীকে তোয়াজের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। বৌদি বল্লেন, 'তোমার ইন্সিওরের পলিসির প্রিমিয়াম, সংসারের টাকা বাঁচিয়েই দেব। তোমায় চিন্তা করতে হবে না। আমিও তো কিছু রোজগার করি। একেবারে বেকার তো নই।' — তা ঠিক। অগত্যা সুশোভন বাবুও ঐ যুক্তির কাছে হার মানলেন। সুশোভন বাবুর খাওয়ার মেনুতে সপ্তাহে তিনদিন খাসির মাংস, গাওয়া ঘিয়ের লুচি, পায়েস, দু-বেলা মাছ, দু'দিন ডিম ইত্যাদি আছেই। মাঝেমধ্যে বিরিয়ানি, পোলাও। বৌদির অত সুন্দর হাতের রান্না, সুশোভন বাবু মনের সুখে খাচ্ছেন আর তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছেন। মনে মনে হাসছেন — সেই একঘেয়ে ঘি-আলু ভাতে, ডাল ভাতে, ডিম ভাতে দিয়ে ভাত খাওয়া। তারপরেই অফিসে দৌড়নো। ছুটির দিকে ডাল আর মাছ করা হ'ত। মায়ের মৃত্যুর পর রকমারী খাওয়াই ভুলে গেছিলাম।

(৫)

একদিন অফিসে কাজ করতে করতে বুকের বাঁদিকে অসহ্য চাপা যন্ত্রণায় সুশোভন বাবু কাতর হয়ে পড়লেন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চারিদিক অন্ধকার। অফিসে লোডশেডিং হয়ে গেল। কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বিপাশারা সুশোভন বাবুর গোঙানীর আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি সকলে ছুটে এল। বিজন, অনিমেষরা ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দিয়ে অফিসের ডাক্তারকে ফোনে জরুরী খবর পাঠালেন। মুখের একটা দিক বেঁকে গেছে। মুখ দিয়ে গ্যালজা বের হচ্ছে। ইশারায় একবার দেখালেন — মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু এসে ভাল করে দেখে একটা ইন্জেকশন দিয়ে অনিমেষেদের বললেন — এক্ষুণি বড় হসপিটালে আই.সি.সি.ইউ-তে ভর্তি করতে হবে। আমি লিখে দিচ্ছি। মনে হচ্ছে সেরিব্রাল স্ট্রোক বাহাত্তর ঘন্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে বড় সরকারি হাসপাতালের আই.সি.সি.ইউ.-তে ভর্ত্তি করা হোল। সোনালী বৌদিকেও খবর দেওয়া হ'ল। উনিও খুব ভেঙে পড়লেন। কিন্তু বাহাত্তর ঘন্টা কাটল না। সুশোভনবাবু ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গলোকে পাড়ি দিলেন।

(৬)

সোনালী বৌদির দুর্দশার কথা চিন্তা করে অনিমেষরা ইউনিয়নের নেতাদের ধরাধরি করে, ম্যানেজমেন্টের ঘরের সামনে ধর্না দিয়ে সোনালী বৌদির ঐ অফিসেই চাকরীর ব্যবস্থা করলেন। সোনালী বৌদিও ওদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাঁর এই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। ইতোমধ্যে সুশোভনবাবুর মোটা টাকার ইনসিওরের টাকা বোনাস সহ সোনালী বৌদি পেয়ে গেছেন। চাকরীটাও হয়ে গেল। চাকরীর ছয়মাস অতিক্রান্ত। সোনালী বৌদি চাকরী পেয়ে ইনসিওরেন্সের এজেন্সী ছেড়ে দিয়েছেন। মন দিয়ে অফিস করেন। সুমনা, বিপাশারা আজকাল লক্ষ করছে-সোনালী বৌদির চাল-চলনে বেশ কিছু পরিবর্তন। বিপত্নীক ডেপুটি সেক্রেটারী গুপ্ত সাহেবের চেম্বারেই সোনালী বৌদির কাজটা বেশী পড়েছে। সোনালী বৌদি ফাইল নিয়ে তাঁর চেম্বারে ঢুকলে আজকাল ঘর থেকে বেরোতে বেশ দেরী হচ্ছে। উনি ঢুকলেই গুপ্ত সাহেবের চেম্বারের দরজায় প্রায়ই লাল বাতিটা জ্বলে ওঠে। বিপাশারা খুবই বিরক্ত কিন্তু সুশোভনদা'র কথা ভেবে বৌদিকে কড়া কথা, বলব বলব ভেবেও বলতে পারে না। হঠাৎ একদিন অফিসে টিফিনের সময়ের একটু আগে গুপ্ত সাহেবের খাস পিওন প্রত্যেকের টেবিলের উপর একটা করে বড় মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে গেল। কিজন্য ঐ প্যাকেট দিচ্ছে কিছুতেই বলল না। পরে বিপাশারা জানতে পারল — গুপ্ত সাহেব গতকাল সোনালী বৌদিকে বিয়ে করেছেন। তারই খুশিতে মিষ্টিমুখ।